ইসলামে যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি

আধুনিক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও আঙ্গিকে

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচনা বক্তব্য

১. আল্লাহ দুনিয়া এবং এর সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা ও মালিক। আর একারণেই তিনিই এর একমাত্র একক রক্ষাকর্তা ও ধ্বংসকারী।

২. যেহেতু তিনি গোটা দুনিয়া ও এর সৃষ্টিকুলের মালিক, সেহেতু তিনিই হচ্ছেন গোটা বিশ্বের সার্বভৌমসত্তা, একমাত্র প্রভু।

৩. মানুষকে তিনি খলিফা হিসাবে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন; সুতরাং একমাত্র তারই আদেশ-নির্দেশ মোতাবেক বিশ্ব-পরিচালনার দায়িত্ব বহন করবে সে।

৪. প্রতিটি মানুষই আদম (আঃ)-এর সন্তান ও অধঃস্তন পুরুষ। সেহিসাবে জাতি-ধর্ম-বংশ-ভাষা ও বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের প্রাণ-মান ও সম্পদ পবিত্র এবং মর্যাদামণ্ডিত।

৫. আল্লাহর মনোনীত দ্বীন বা বিধান ইসলাম। এই বিধানের শাব্দিক অর্থ শান্তি, পারিভাষিক অর্থে- আল্লাহর প্রতি সচেতনভাবে পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পন।

এই সচেতন হৃদয় মন নিয়ে যে আল্লাহর নিকট নিজেকে সমর্পিত করে তাকেই বলে মুসলমান। মুসলমান হওয়ার পথে বা মুসলমান হয়ে জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে যারা বাধা সৃষ্টি করে, দুঃখ দেয়, প্রাণনাশের হুমকি ও আক্রমণ রচনা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। হিজরত-এর ইতিহাস ও মদীনাজীবন হতে শুরু করে মক্কা বিজয়ের পর রাসূলে পাক (সা.) এর জীবন ও কর্মের ইতিহাস এর উজ্জ্বল নিদর্শন।

"সীরাত ইবনে হিশাম" গ্রন্থের আলোকে উক্ত ৫টি মৌলিক নির্যাস (essence) এর ভিত্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে "ইসলামে যুদ্ধ ও বিশ্ব শান্তি ঃ আধুনিক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও আঙ্গিকে" শীর্ষক প্রবন্ধটি যা' জনাব সাজ্জাদ হোসাইন খান সম্পাদিত মাসিক কলমে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রয়োজনীয় কলেবর বৃদ্ধি করে, বিশেষ করে আধুনিক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও আংগিকের উল্লেখ পূর্বক পুস্তকাকারে এটি প্রকাশের মনস্থ করি। উদ্দেশ্য : যদিও ইসলামে যুদ্ধ এবং এর উপর অনেক খ্যাতিমান লেখকের বিপুল পরিমাণ বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে, তবু আমি মনে করি বরং এটা আমার সুদৃঢ় প্রতিতী যে এই গ্রন্থটি জাতি-ধর্ম-কাল নির্বিশেষে পূতপবিত্র মানব গোষ্ঠীর চিত্তে নবতর চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটাতে যথেষ্ট সহায়ক হবে এবং এহেন চেতনার উৎকর্ষ বর্তমান আদর্শখরা যুদ্ধগ্রস্থ বিশ্বমানবতার যথার্থ পরিত্রাণ অর্জনে ইসলামই যে একমাত্র "প্যানেসিয়া ফর অল ইলস" তা বাস্তবসম্মতভাবে প্রদর্শনে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

www.pathagar.com

এই প্রসংগে আমি আমার পরম হিতৈষী 'ঝিঙেফুল' প্রকাশনার জ্ঞান পিপাসু মালিক জনাব গিয়াস উদ্দিন সাহেবের নিকট অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এজন্যে যে এ ধরনের গ্রন্থের রুচি বিশিষ্ট পাঠকের খরা থাকা সত্ত্বেও তিনি এটা ছাপানোর ঝুঁকি নিয়ে শুধু আমাকেই নয় বরং শান্তি প্রিয় বিশ্ববাসীকে শান্তি স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করতে পরম অবদান রেখেছেন অবশ্যি।

এই প্রসংগে আর একটি পরম সৌভাগ্যের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। আমার অনুজ ড. হাসান মুহাম্মদ মইনুদ্দিন, চেয়ারম্যান ইসলামী দাগাহ্ ও শরীয়া। দারুন ইহসান ইয়ুনিভার্সিটি ও নূরানী তালিমূল কোরআন বোর্ডের অধ্যক্ষ হযরত মাওলানা আহমদুল্লাহ সাহেব স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে গ্রন্থের কতিপয় অংশের পরামর্শ দান ও সম্পাদনা করে গ্রন্থটির তথ্যগত সৌন্দর্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন পরমভাবে। তা হচ্ছে এই যে, 'ইসলাম শুধু আত্মরক্ষামূলক নয়, বরং প্রয়োজনে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ মুসলমানদের জন্য ফরজে আইন হিসাবে পালনীয় করেছে। তাদের মতে সুরা আনফাল ও সুরা তাওবা-এর তাফ্ছীরসহ অনুবাদ পাঠে ইসলামের যুদ্ধ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন সংশ্লিষ্ট সবার জন্য অত্যাবশ্যক। আশা করি পাঠক সমাজ উক্ত দুটি সুরা অধ্যায়নের প্রেক্ষাপটে এই গ্রন্থের তাৎপর্য উপলব্ধিতে দারুণ উৎসাহিত ও উপকৃত হবেন বৈকি।

আল্লাহ্ আমার ও আমার সহৃদয় পরাম প্রকাশকের সদিচ্ছা গোটা বিশ্বের জন্য বরকতময় করুন এবং এই সুবাদে আমাদের সবাইকে তাঁর অপার করুণা লাভে দুনিয়া ও আখেরাতে সুন্দর ও সমৃদ্ধ জীবন দান করুন, আমীন।

নাচীজ

মুহাম্মদ আলমগীর

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

অধ্যক্ষ আলমগীরের এটি ২৭ তম প্রকাশনা। ইসলামে যুদ্ধ ও আধুনিক যুদ্ধের ওপর অনেক গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে; কিন্তু তাঁর এই গ্রন্থটি অনন্য এই দৃষ্টিতে যে এতে যুদ্ধের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে এ পর্যন্ত বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত।

জনাব অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষা চিন্তাবিদ, প্রবন্ধকার ও শিশুতোষ সাহিত্যিক। তাঁরা কতিপয় গ্রন্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া (কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড), নূরানী তালিমুল কোরআন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকসহ বাংলাদেশ স্কুল টেক্সবুকবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত দুটি ইংরেজি ছড়া বই বিভিন্ন স্কুল-মাদ্রাসায় সিলিবাসভুক্ত করা হয়েছে। চলতি বছর তাকে প্রখ্যাত "মুসলিম সাহিত্য সমাজ" কর্তৃক ২০০৭ সালের ক্রেস্ট প্রদান করে তাঁর সাহিত্য শিক্ষার মেধার বিশেষ স্বীকৃত দিয়েছেন। ইসলামি কিন্ডারগার্টেন-এর শিক্ষা দান পদ্ধতিসহ ইসলামি দিক নিদের্শনামূলক প্রথম আধুনিক শিক্ষা ও ইসলামি শিক্ষা সমন্বয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদশা ফয়সাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ তিনিই। ১৯৯৭ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর নরসিংদী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসাবে ৫ বছর শিক্ষা দানে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানেও তিনি উত্তরা আদর্শ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং ঢাকার দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, ধানমন্ডির শিক্ষা ডিপার্টমেন্টের ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত আছেন।

উল্লেখ্য, ইসলামী রাজনীতি করার অপরাধে (?) তাকে ভারতের স্টেট আগরতলার জেলখানায় প্রায় ছয় মাস কারাবাস ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁর ভারতের জেলে আমার বন্দী জীবন শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশনার জগতে নিঃসন্দেহে একটি অনন্য অবদানও।

যুদ্ধ সবসময়ই নিন্দনীয় ও মারাত্মক—এ কথাটা সর্বোতভাবে সত্য ও সঠিক নয়, অন্তত ইসলামের যুদ্ধ-এর ক্ষেত্রে। যুদ্ধ 'মানবিকতা এবং শান্তি সৃষ্টি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কখনো কখনো অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। এটি একমাত্র ইসলামেই জীবন বিধান হিসাবে অপরিহার্য করা হয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান বিশ্বের পরাশক্তিদের

www.pathagar.com

অন্যতম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর দোসরদের যুদ্ধ ও শান্তির কীর্তিকাণ্ড ও মুরুব্বীয়ানার প্রেক্ষিতে এই সত্যের স্বীকৃতি ঐতিহাসিকভাবে কালজয়ী। অন্তত অধ্যক্ষ আলমগীর স্যারের "ইসলামে যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি : আধুনিক যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও আঙ্গিকে" শীর্ষক এই গ্রন্থটি এর একটি আনকোরা দৃষ্টান্ত। সুধী পাঠক এইটুকু হৃদয়ংগমে সক্ষম হলে এর প্রকাশনা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

বিনীত

মোঃ গিয়াসউদ্দিন (খসরু)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ : কারণ ও পরিণতি ১১—৩০

ক. যুদ্ধ মানবসৃষ্ট বিপর্যয় (War is a man made disaster) ১১

খ. যুদ্ধে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বীভৎষতা ১৩

গ. সূর্যশেখরের মার্কিনী দৃষ্টিভংগীর বিশ্লেষণ ১৪

ঘ. বিশ্বপরিবেশে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ২১

ঙ. যুদ্ধের প্রস্তুতিতে পরিবেশ দুষণ ২৩

চ. কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প : গ্যাসচেম্বারে হত্যা ২৫

ছ. যুদ্ধবন্দীদের প্রতি পরাশক্তির আচরণ : কতিপয় দৃষ্টান্ত ২৬

জ. চালর্স গ্রেনারের দশ বছর কারাদন্ডে মাতা ইরমার মন্তব্য ২৯

ঝ. চীনে মানবিক চেতনার উন্মেষ ২৯

ঞ. শেখ ইউসুফ আলীর পণবন্দী হত্যা প্রসংঙ্গে ফতোয়া ৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামে যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি ৩১—৪৫

ক. ইসলামে যুদ্ধ : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ৩১

খ. ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বের দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ৩৩

গ. ইসলামের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক শৃংখলা : দার আল্ ইসলাম ও দার আল্ হার্ব প্রসংগে ইমাম আবু হানিফা ৩৬

ঘ. কতিপয় মনীষীর দৃষ্টিতে দার আল্ ইসলাম ও দার্ আল্ হরব ৩৮

ঙ. ইসলামে যুদ্ধ কঠিন ইবাদত ৪০

চ. ইসলামে যুদ্ধবন্দীদের মর্যাদা ৪৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মানবতা ও পরিবেশ রক্ষায় ইসলামের যুদ্ধ ৪৬—৬৭

ক. মানবিক আচরণ প্রসংগ ৪৬

খ. রাসূল (দ.) এর যুদ্ধ-পটভূমি ও যুদ্ধনীতি ৪৭

গ. রাসূল (দ.) এর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রকৃতি ও পরিসীমা ৫০

ঘ. যুদ্ধাবস্থায় শান্তি ও সৌহার্দ্য রচনায় শেখসাদীর নীতিমালা ৫৩

ঙ. ইসলামে যুদ্ধাপরাধীর প্রতি আচরণ-নীতি ৫৭

চ. মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মর্যাদা ও অধিকার ৫৯

ছ. ইসলামে হত্যার বিচার ও পরিণতি ৬১

জ. ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস ৬৪

www.pathagar.com

সূচিপত্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামে যুদ্ধনীতি : নাযিলের পটভূমি নির্দেশনা ৬৮—৭৬

ক. প্রাসংগিক পটভূমি ৬৮

খ. বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গ (২য় হিজরী, ৬২৪ খ্রি.) ৬৯

গ. ওহুদ যুদ্ধ প্রসংগ ৭০

ঘ. বনুকাইনুকার বিরুদ্ধে অভিযান [২য় হিজরী, ৬২৪ খ্রি.] ৭২

ঙ. বানু নাজীরের যুদ্ধ [৩য় হিজরী, ৬২৫ খ্রি.] ৭২

চ. বানু কুরাইজার যুদ্ধ [৫ম হিজরী ৬২৭ খ্রি.] ৭২

ছ. বানু মোস্তালিকের যুদ্ধ [৫ম হিজরী ৬২৭ খ্রি.] ৭৩

জ. খায়বার যুদ্ধ [৭ম হিজরী, ৬২৮ খ্রি.] ৭৪

ঝ. গণীমত প্রসংগ ৭৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইসলাম ও আনবিক যুদ্ধ ৭৭—৭৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরিশিষ্ট ৮০—৯৫

ক. যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী সামরিক আগ্রাসন ও নৃশংসতার চিত্র ৮০

খ. মানবিক আইনের প্রেক্ষাপট ও আন্তর্জাতিক আইন ৮২

গ. প্রাচীন কাল, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক যুগের মানবিক আইন প্রসংগ : ৮৪

ঘ. আধুনিক যুগে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ক্রমবিকাশ : প্রসংগ-কথা ৮৫

ঙ. প্রসংগ : জুইশ কমউনিটি ও আমেরিকার ইসরেল প্রীতি ও ভীতি ৮৫

চ. আমেরিকান মিডিয়ার মুঠোবন্দী দুর্ভাগা পৃথিবী ৮

ছ. জনৈক শিল্পীর চোখে জুইশ কমিউনিটি অত্যাচারিত থেকে অত্যাচারী হওয়ার সত্য চিত্র : ৯২

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৯৬

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ : কারণ ও পরিণতি

যুদ্ধ ইংরেজী War, যেটার সংগা হর্ণবি-এর অভিধান অনুযায়ী "A fight carried on between nations or parties by force". সুতরাং যুদ্ধের জন্য ৩টি উপকরণ বা elements দরকার : ১. সংঘর্ষ বা fight ২. জাতির সাথে জাতি অথবা দলের সংঘর্ষ (Conflict between/among races or nations) ৩. শক্তি প্রয়োগের কার্যকারিতা (Fruitful execution of force)।

ক. যুদ্ধ মানবসৃষ্ট বিপর্যয় (War is a man made disaster)

এই বিপর্যয় সৃষ্টির মূলে যেসব শ্বাশ্বত কারণ বিদ্যমান তন্মধ্যে নিম্নগুলো প্রধান বলে চিহ্নিত করেছেন আধুনিক যুদ্ধবিশ্লেষকগণ :

১. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে খাদ্যাভাবের কারণে খাদ্যান্বেষণে ভূমিদখল (War due to Natural Disaster & to have land to sustain) অতীতের ইতিহাসে দেখা যায় ঝড়তুফান, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে সৃষ্ট খাদ্য ও বাসস্থানের অভাব মিটানোর জন্য মানবকুল ভূমি দখলের নিমিত্তে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।

নিজের এবং নিজের গৃহপালিত পশুপাখীর খাদ্যসংকট ও আবশ্যিক সমস্যা সমাধানের জন্য শক্তিশালী মানবগোষ্ঠী দুর্বল ও নির্বোধ জনগোষ্ঠীকে পরাজিত ও অধীনস্থ করেছে যুদ্ধের মাধ্যমে। প্রাচীন ভারতের আর্য-অনার্যের সংঘর্ষ অনেকটা এই ধরণেরই ছিল। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের যুদ্ধসমূহেও এর নিদর্শন রয়েছে।

২. ধনসম্পদের জন্য যুদ্ধ (War for Wealth and Riches) : সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে দেখা যায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ঐশ্বর্য ও সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পতিত হওয়ায় অনেক শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্টগুলোকে আক্রমণ

www.pathagar.com

করছে। বিপুল সম্পদ ও ঐশ্বর্যের মালিকানা একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে তুলনামূলকভাবে পড়শী রাষ্ট্র থেকে অনেক নিরাপদ ও শক্তিশালী করে; এহেন চিন্তা ও প্রত্যয়ে বড় রাষ্ট্রগুলোর শাসক শ্রেণী, তদীয় মন্ত্রী, আমীর ও ওমরাহদের প্ররোচনা ও পরামর্শে যুদ্ধবাজ হয়ে দাঁড়ায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে গ্রীকরাজ আলেকজান্ডারের পাকভারত আক্রমণ থেকে শুরু করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় যেসব যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছে এর প্রধান কারণ ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পদের লিপ্সা ও অর্থগৃধ্নুতা তথা উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদের লালসা।

৩. ক্ষমতার বড়াই এর জন্য যুদ্ধ (War for Powers) : ইউরোপীয় বড় রাষ্ট্রগুলো যেমন : যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানী, ইটালী, সাম্রাজ্যবাদীর চরিত্র ধারণ করেছিল সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য; চৌদ্দশতক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম সিকিভাগ পর্যন্ত। ধনবল, জনবল ও ভূমিবল বৃদ্ধির মাধ্যমে কোন্ রাষ্ট্র সবচেয়ে ক্ষমতাধর তা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য এহেন ক্ষমতা বৃদ্ধির লড়াই সে সময়ে ছিল রাষ্ট্রীয় তথা সংশ্লিষ্ট জাতির মর্যাদা-প্রদর্শনের অত্যাবশ্যকীয় স্বভাব। পররাজ্য গ্রাসের মাধ্যমে স্বীয় শক্তি ও প্রতাপের প্রতিযোগিতার শিকার হয়েছিল সেসময়কার এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার জনগণ ও এদের ধনসম্পদ। Might is Right ছিল তখন ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের State creed বা রাষ্ট্রীয় ধর্ম।

৪. নিরাপত্তা বিধানের জন্য যুদ্ধ (War for Security) : পড়শী রাষ্ট্রের আক্রমণ থেকে স্বীয় রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য নিয়মিত সামরিক বাহিনীর সৃষ্টি, প্রসার ও এর মহড়ার বিধি ব্যবস্থা চালু করা হয়। জরুরী সংকটের মোকাবেলায় শত্রুরাষ্ট্র আক্রমণের পূর্বে নিজেই যেন এর প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে এই ধরনের মনমানসিকতার পরিণামে নিয়মিত সেনাবাহিনী ও সামরিক সমৃদ্ধি ঘটে প্রতিটি রাষ্ট্রে। ফলে কালক্রমে Offensive এবং Defensive attack এর চিন্তাভাবনা থেকে বিপুল সেনাবাহিনী ও সমরাস্ত্রের ক্ষমতা অর্জন ও প্রদর্শনে যুদ্ধাবস্থা ও যুদ্ধের পরিবেশ গোটা বিশ্বজুড়ে সৃষ্টি হয়েছে, যা বর্তমানের বিশেষ করে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব ও দাপট প্রদর্শনের একটি বৈশ্বিক স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

www.pathagar.com

খ. যুদ্ধে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বীভৎষতা

উক্ত প্রধান ৪টি কারণের সৃষ্টি ও চেতনায় মানবতা ও নৈতিকতার চিন্তা এবং কর্তব্যনিষ্ঠার সচেতনতা না থাকায় এর সামষ্টিক চূড়ান্ত পরিণতির অভিব্যক্তি-ই হচ্ছে ১৯১৪ সালের প্রথম ও ১৯৪৩ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এ দুটি যুদ্ধের ক্ষত কত গভীর ও ব্যাপক তা বর্তমান গোটা বিশ্বের অধ্যুষিত ৬শত কোটি অধিবাসীর ৭৫% জন অদ্যাবধি নানা জটিল ও বিকলাংগ-ব্যাধি বয়ে নিয়ে চলছে। প্রতিবছরই এ দুটি বিশ্বযুদ্ধ বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক এটম বোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি নগরীতে যে নারকীয় দৃশ্য সৃষ্টি হয়েছিল তা আজও ইতিহাসের স্মৃতিপটে গণগণে হয়ে রয়েছে। জাপানিরা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ফী বছর আনুষ্ঠানিকভাবে এই নারকীয় দিবসটি পালন করছে। এ দুটো যুদ্ধের বীভৎস দৃশ্যাবলীর কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করা হল। সংবেদনশীল সুধী পাঠক এর মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বের ক্ষমতাপূজারী ও সম্পদলুণ্ঠনকারীদের বিধ্বংসী যুদ্ধের পটভূমিতে ইসলামের যুদ্ধে বিশ্বমানবতার মূল্য ও মর্যাদার তুলনামূলক বাস্তবতা দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট ও সত্যনিষ্ঠ আগাম প্রত্যয় অর্জনে সক্ষম হবেন বৈ কি।

অতীতে যুদ্ধ ছিল এক পক্ষের অস্ত্রধারী সৈন্যের সাথে অন্য পক্ষের সৈন্যের সরাসরি মোকাবেলা করে হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত করা। তখন Soldiers with rifles were the most important part of an army. কিন্ত বর্তমানের বিশেষ করে বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধের সমরকৌশলের আংগিকে অতীতের যুদ্ধকৌশল প্রায় ১০০% ভাগই যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার ও কৌশলগত (in technique and strategy) শিল্পকলায়।

দৃষ্টান্ত : এটম বোমার অধিকার ও এর প্রয়োগে জাপানের (১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট প্রথম ও ৯ই আগাষ্ট দ্বিতীয় বিষ্ফোরণ ঘটে) হিরোশিমা ও নাগাসাকি নগরীদ্বয়ের অধিবাসীকুল নিমেষে ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব যুদ্ধ যুগপৎ ত্বরিত ও বিপুল ধ্বংসাত্মক আকারের হওয়ায় যুদ্ধবিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের মন্তব্য : "That a full-scale atomic war might destroy the civilization as we know it", আমাদের জানা গোটা সভ্যতাই ধ্বংস ও লয় পেতে পারে যদি পূর্ণমাত্রায় পারমাণবিক যুদ্ধের প্রসার হয়। পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রের সাম্প্রতিক গবেষণা ও সমৃদ্ধি এবং এর সংরক্ষণ এই ধ্বংসকে আরো পূর্ণমাত্রা দান করছে। এ ধরনের বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংসের প্রচণ্ডতা যেমন ব্যাপক তেমনি এর আর্থিক খরচও রীতিমত হৃদক্রিয়া বিপর্যয়ক। দৃষ্টান্ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিদিনের ব্যয়ের

www.pathagar.com

পরিমাণ ছিল সে সময়কার ২৫০,০০০, ০০০ (২৫ কোটি) ডলার। উল্লেখ্য, জাপান পার্ল হারবারে মর্কিন প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরে হামলা চালিয়ে ৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। "হিরোশিমা-নাগাসাকি দিবসে ইসলামের আহবান" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবন্ধকার জনাব মুহাম্মদ ফয়জুল হক এ দুটি শহরের ধ্বংসযজ্ঞ ও এর পরিণতির যে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন এর প্রাসংগিক কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

"১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট পারমাণবিক বোমাটি বিস্ফোরিত হওয়ায় তাতে হিরোশিমা শহরে একদিনে মানুষ মারা গিয়েছিল ১ লাখ ৪০ হাজার। অধিক তেজস্ক্রিয়তার ফলে তাপমাত্রা বেড়ে হয়েছিল ৪ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। মানুষ ও আসবাবপত্রগুলো মোমের মতো গলে গিয়েছিল। একই বছরের ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে নিক্ষেপিত বোমায় প্রথম দিন মারা গিয়েছিল ৭৪ হাজার মানুষ। গাছপালা, তরুলতা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। পারমাণবিক বোমার আর একটি ভয়াবহ দিক হল এর বিকীরণ। এই বিকীরণে পরবর্তী ৫ বছরে এ দুটি শহরে মারা গিয়েছিল ২ লাখ ৮০ হাজার মানুষ। এখনও সেখানে সবুজ গাছপালা জম্মায় না। পানি থাকে বিষাক্ত। শিশু জম্মায় বিকলাঙ্গ, প্রতিবন্ধী হয়ে। বড় হয় ক্যান্সার রোগ নিয়ে।"

প্রবন্ধকার এ প্রসংগে আরো উল্লেখ করেন যে হিরোশিমা নাগাসাকির চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী আণবিক বোমা বর্তমানে বিভিন্ন দেশে রয়েছে। এক হিসাব মতে, পৃথিবীতে ৪৬টি দেশে ৩৪০ টি পারমাণবিক চুল্লি এবং ৪৭৫ টি বিদ্যুৎ উৎপাদক চুল্লি (২০০৭ইং পর্যন্ত) রয়েছে। এসব চুল্লি থেকে হাজার হাজার বোমা তৈরী সম্ভব। কেবল আমেরিকা ও রাশিয়ার হাতেই রয়েছে ৫০ হাজারের মতো পারমাণবিক বোমা। এগুলো সংরক্ষণ করতে গিয়ে ঘটছে পরিবেশ বিপর্যয়। এ পর্যন্ত কম করে হলেও ২০টি দুর্ঘটনায় হাজারেরও বেশি মানুষ ও প্রাণী মারা যায়, গাছপালা ধ্বংস হয় অসংখ্য।

গ. সূর্যশেখরের মার্কিনী দৃষ্টিভংগীর বিশ্লেষণ

দৈনিক ইত্তেফাকের Post Editorial শীর্ষক প্রবন্ধে জনাব সূর্য শেখর সাম্প্রতিক কালের যুদ্ধ কৌশলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ১৯৮৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আধুনিক যুদ্ধগুলোকে চারটি প্রজন্মে (Generation) ভাগ করেছে। এগুলো হচ্ছে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ (First, second, third and fourth generation warfare)।

www.pathagar.com

প্রথম প্রজন্মের যুদ্ধ যা ফার্স্ট জেনারেশন ওয়ারফেয়ার সেসব যুদ্ধগুলোকে বুঝায়, যেগুলো নিয়ন্ত্রিত ইউনিফর্মধারী সৈনিকদের দ্বারা লাইন এবং সারিবদ্ধ কৌশল (Line and column tactics)-এর মাধ্যমে পরিচালিত। ১৬৪৮ সালে Treaty of Westphalia-এর মাধ্যমে যখন ৩০ বৎসরের যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে তখনই নেশন স্টেট্সের প্রতিষ্ঠা হয়। এতে নেশন স্টেটগুলো নিজস্ব সামরিক বাহিনী গঠন ও রক্ষাণাবেক্ষণ শুরু করে। এর পূর্বে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করত কন্ডোটেরি (Condotierri), শক্তিশালী নোবেলগণ, স্থানীয় সংগঠনসমূহ, নগরকেন্দ্রিক লীগসমূহ ইত্যাদি। প্রথম প্রজন্মের যুদ্ধ সেনাবহিনীগুলোকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এনে একটি সরাসরি যুদ্ধের সূচনা ঘটায় এবং বিভিন্নভাবে সামরিক ক্ষেত্রে তার অবদান রাখে। প্রধান অবদানসমূহ ছিল যুদ্ধের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ, সৈন্যদের পদবিন্যাস, ইউনিট এবং ফরমেশন সৃষ্টি, সামরিক ড্রিলের সফল ব্যবহার এবং অতিরিক্ত গোলাবর্ষণের ক্ষমতা। ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ, এ্যাংলো-স্প্যানিশ ওয়ার, আমেরিকান রেভ্যুলিউশনারী ওয়ার, নেপোলিয়নিক ওয়ার, ১৮১২ সালের যুদ্ধ এবং মেক্সিস ওয়ার অব ইনডিপেন্ডেন্স হচ্ছে প্রথম প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধসমূহ।

যুদ্ধক্ষেত্রে রাইফেলড্ মাস্কেট (Rifled musket) এবং ব্রীচ লোডার **(Breech loader) ব্যবহার শুরুর সাথে সাথে প্রথম প্রজন্মের যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।** এর বড় কারণ ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে এই নতুন অস্ত্রসমূহের ফায়ারের মুখে সৈনিকদের বড় বড় লাইন অসহায় হয়ে পড়ে। ফলে **উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শুরু হয় দ্বিতীয় প্রজন্মের যুদ্ধ।** দ্বিতীয় প্রজন্মের যুদ্ধের প্রথম 'লাইন অব ব্যাটেলস রক্ষা করা হয় ইউনিটগুলো ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে; সামনের দিকে অগ্রসর করে। এই ছোট ছোট দলগুলো দ্রুত অগ্রসর হতো এবং 'কাভার সুব্যবহার করে ছোট ছোট দলে অভিযান পরিচালনা করত। ফলে হতাহতের সংখ্যা হতো কম।' **দ্বিতীয় প্রজন্মের যুদ্ধে** আমরা দেখতে পাই ট্রেনচ্ বা পরিখার বিপুল ব্যবহার, আর্টিলারির কার্যোপোযোগিতা, উন্নত তথ্যানুসন্ধান (reconnaissance) পদ্ধতি এবং ক্যামোফ্লাজ পোশাক, রেডিও যোগাযোগ এবং ফায়ারটিম ম্যানুভারের (Fireteam manoeuvre) বহুল ব্যবহার। দ্বিতীয় প্রজন্মের যুদ্ধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ, এ্যাংলা -আইরিশ যুদ্ধ, স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধ , দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ, ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রজন্মের যুদ্ধ শুরু হয় Blitzkrieg রণকৌশল উদ্ভাবনের সাথে। তৃতীয় প্রজন্মের যুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল গতি এবং বিস্ময় (Speed

and Surprise)। শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া, শত্রুর পশ্চাতে অবস্থিত ইউনিটগুলো ধ্বংস করা এবং শত্রুর আসঞ্চনে (cohesion) অবনতি ঘটানো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স আক্রমণের সময় এ কৌশলটি প্রথম পরীক্ষিত হয়। এতে ট্যাংক, মেকানাইজড ইনফিন্ট্রি এবং বিমান সহায়তা নিয়ে জার্মানরা চিরাচরিত প্রতিরক্ষা লাইনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। একই কৌশল অনুসরণ করা হয় কোরিয়, ভিয়েতনাম এবং উপসাগরীয় যুদ্ধে। যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রজন্মের যুদ্ধের অবদান হচ্ছে সুচতুর যুদ্ধ কৌশলের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত অসুবিধাসমূহ অতিক্রম করা। দীর্ঘ লাইনে প্রতিরক্ষায় মোতায়েন করার পদ্ধতি শেষ হওয়ার সাথে সাথে শুরু হয় দ্রুত চলাচল ও ম্যানভার (manoeuvre) করার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার। হেলিকপ্টার এনেদেয় শত্রুর পশ্চাতে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়া প্রবেশের সুযোগ, এবং মিসাইল প্রযুক্তিক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় শত্রুর গভীরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে আঘাত করার। ফলে ইউনিটসমূহ অর্জন করে স্বাধীনভাবে অপারেশন পরিচালনা করার দুর্লভ ক্ষমতা, আর এজন্যে অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় জুনিয়র নেতৃত্বের উপর।

তৃতীয় প্রজন্মের যুদ্ধকে প্রতিস্থাপন করে চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ বা ফোর্থ জেনারেশন ওয়ারফেয়ার (4GW)। এ যুদ্ধে উন্নত দেশসমূহের সামরিক প্রাধান্য নিস্তেজ হয়ে পড়ে অনুন্নত দেশসমূহের আধুনিক-পূর্বযুগের যুদ্ধ কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে। এ যুদ্ধ যেমন হতে পারে দুটি অসমান রাষ্ট্রের মধ্যে তেমনি হতে পারে দুটি আদর্শের মধ্যে। চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধে তাই যুদ্ধ, রাজনীতি, সৈনিক এবং বেসামরিক ব্যক্তি, শান্তি এবং যুদ্ধ, যুদ্ধ ও যুদ্ধক্ষেত্র, জীবনযাত্রা এবং নিরাপত্তার মধ্যবর্তী বিভাজন রেখা অত্যন্ত অস্পষ্ট। এই যুদ্ধের মূলভাবটি যদিও সন্ত্রাসবাদ এবং অসম যুদ্ধের প্রায় সমার্থক, তথাপি এটাকে আরোও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা যায়। দৃষ্টান্ত: স্পার্টকাসের অধীনে দাসদের বিদ্রোহ এবং রোমান সিনেট কর্তৃক জুলিয়াস সিজার বধ। চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধের সময় যখন সুপার পাওয়ার এবং মেজর পাওয়ারসমূহ তাদের পূর্ববর্তী কলোনী ও অধিকৃত অঞ্চলসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। উন্নত দেশসমূহের বোমারু বিমান, ট্যাংক ও মেশিনগানের বিরুদ্ধে প্রযুক্তিগত দুর্বলতা নিরসনের লক্ষ্যে Non State actor সমূহ ব্যবহার করা শুরু করে গোপনীয়তা, সন্ত্রাস এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য প্রচলিত মাধ্যমগুলো। মাও সেতুং-এর জনগণের যুদ্ধ এবং হো চি মিনের ইন্দো-চায়না যুদ্ধ, এবং লেবানন যুদ্ধসমূহকে চতুর্থ

www.pathagar.com

প্রজন্মের যুদ্ধ হিসেবে ধরা যেতে পারে। চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ সাধারণত নিজস্ব সরকার স্থাপন করার উদ্দেশ্যে একটি ইনসার্জেন্ট দল অথবা Non State actor পরিচালনা করে থাকে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তি স্থাপনের জন্য শত্রুর লোকবল ও অর্থবল এমনভাবে ব্যয় করানো যাতে করে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায় এবং দখলকারী দল পরবর্তীতে হয় আত্মসমপর্ণ করে, অথবা পিছু হটতে বাধ্য হয়। চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ পোড়ামাটি নীতির কৌশল অবলম্বন করে যাতে দখলকারী কর্তৃপক্ষ শাসন করার জন্য কোন সম্পদ বা অবকাঠামো না পায়।

চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ যা মূলত একটি অসম যুদ্ধ তা মানবমাত্রাকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেয়। এ যুদ্ধের আরেকটি অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে চেচনিয়াতে রাশিয়ানদের শোচনীয় পরাজয়। যখন চেচেনরা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা তাদের স্বাধীনতার জন্য সামরিক শক্তি ব্যবহার করবে তখন তারা তাদের প্রিয় রাজধানীকেও যুদ্ধক্ষেত্র বানাতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেনি। গ্রজনী ত্যাগ করতে বাধ্য হবার পর এর শক্তিশালী যোদ্ধারা আশেপাশের শহর ও গ্রামগুলোকে ব্যবহার করা শুরু করে যার অনেকগুলো তাদের সীমানার বাইরে ছিল। গ্রজনী এবং অন্যান্য স্বল্প পরিচিত শহর কেন্দ্রিক যুদ্ধে রাশিয়ানদের ব্যর্থতা অসম যুদ্ধের সাফল্যকেই প্রতিভাত করে। যে বিষয়টি এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হচ্ছে : এ যুদ্ধে জয় করার জন্য কোন কঠিন ভূমির প্রয়োজন হয় না; বরং যুদ্ধে সাফল্য ছিনিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন পড়ে সৈনিকদের মনোবল, দৃঢ়তা ও বিজয় অর্জনের অদম্য ইচ্ছা।

প্রসংগ : চেচেন-সোভিয়েট যুদ্ধ : জনাব সূর্য শেখর চেচেন-সোভিয়েটের যুদ্ধ প্রসংগ টেনে বলেন :

১৯৯৪ সাল। এ সময়টায় সোভিয়েট ইউনিয়ন চেচনিয়াতে বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়। বরিস মিলিটারী দিয়ে তা নির্মূল করতে উদ্যত হন। গ্রজনীতে রাশিয়ান সেনাবাহিনীর বিপর্যয় শহর কেন্দ্রিক যুদ্ধকে একটি নতুন মাত্রায় নিয়ে যায়। এবং প্রমাণ করে যে, শহর কেন্দ্রিক যুদ্ধে সঠিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি ক্ষুদ্রকায় বাহিনী আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত একটি বিশাল বাহিনীকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রীয় করে দিতে সক্ষম। গ্রজনীতে প্রথম আক্রমণ হয় নভেম্বর ১৯৯৪ সালে। অনুগত 'চেচরা' ৪০টি রাশিয়ান ট্যাংক নিয়ে বিনাবাধায় শহরের কেন্দ্রস্থলে ঢুকে পড়ে। প্রথমদিকে যদিও চেচেনরা বিস্মিত হয়েছিল তথাপি তারা দ্রুত প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং আরপিজি (RPG) ও স্নাইপারের সমন্বিত আক্রমণে রাশিয়ান বাহিনীকে

www.pathagar.com

সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে। ফলে রাশিয়ানদের পরাজয়টি হয় এক কথায় Total। প্রেসিডেন্ট ইয়েলিৎসেন তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী পাবেল গ্রাচেভকে পরবর্তী আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য দুই সপ্তাহ সময় দেন এবং নয় দিন সময় দেন পুরো পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারের জন্য। দ্বিতীয় আক্রমণটি সূচিত হয় ১৯৯৫-এর নতুন বছরের শুরুতে যে দিন ছিল গ্রাচেভের জন্মদিন। চেচেনরা এর মধ্যে বুঝে ফেলে যে, রাশিয়ান সৈন্যরা ট্যাংকগুলোকে পূর্বপরিকল্পনানুযায়ী শহরের মধ্যে প্রবেশ করাচ্ছে। ১৩১ ব্রিগেডের প্রথম ব্যাটালিয়নটি খুবই দ্রুত রেলষ্টেশনে পৌঁছে এবং এরপর যা ঘটে তা হচ্ছে প্রথম আক্রমণের পুনরাবৃত্তি মাত্র। চেচেনরা ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠে এবং পুরো ব্যাটালিয়নটি সমূলে ধ্বংস করে ফেলা হয়। অতঃপর রাশিয়ান বাহিনীকে প্রায় বিশ দিন যুদ্ধ করতে হয় প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস দখল করার জন্য।

চেচেনরা সার্থক হয়েছিল শত্রু সম্বন্ধে বিশদভাবে জ্ঞাত থাকায়। চেচেন যোদ্ধারা রাশিয়ান সেনাবাহিনী সম্পর্কে ভালভাবে জানত। প্রেসিডেন্ট দুদায়েভ ছিলেন সোভিয়েত এয়ার ফোর্সের মেজর জেনারেল এবং সামিল বাসেজেভ ছিলেন সোভিয়েত সেনাবাহিনীর একজন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার। এছাড়া বাকী চেচেন যোদ্ধারা সোভিয়েত সেনাবাহিনীতে কখনো না কখনো চাকরি করেছেন। তাই তারা জানতেন কিভাবে একটি টি-৭২ ট্যাংক ষ্টার্ট দিতে হয় বা কিভাবে একটি আরপিজি ফায়ার করতে হয়। আর্মেনিয়ানদের মত এদের রাশিয়ান মেসে গিয়ে গল্প করতে হয়নি। তারা সবাই রাশিয়ান রণকৌশল সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত ছিলেন। তারা চেয়েছিলেন তাদের প্রিয় শহরের বিনিময়ে হলেও রাশিয়ান সেনারা ধ্বংস হয়ে যাক। তারা অন্ধকারের সুবিধা নিতেন এবং চলাচল করতেন সুয়ারেজ, বেসমেন্ট এবং ধ্বংস প্রাপ্ত দালান-কোঠার ধ্বংস্তুপের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে রাশিয়ানদের কোন ম্যাপ ছিল না।

প্রসংগ : হিজবুল্লাহ-ইসরাইল যুদ্ধ : জনাব সূর্য শেখর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে তুলে ধরেন হিজবুলাহ-ইসরাইল যুদ্ধ। এই যুদ্ধে দুই প্রতিপক্ষের একটি তুলনামূলক চিত্র ছিল নিম্নরূপ :

পুরো দক্ষিণ লেবাননে ইসরাইলের অসংখ্য বিমান আক্রমণের মধ্যে হিজবুল্লাহ যোদ্ধরা ইসরাইলী শহরগুলোকে লক্ষ্য করে প্রতিদিন ৩৫০টি রকেট ফায়ার করেছে। তার মধ্যে কমপক্ষে ১০০টি ইসরাইলী তৃতীয় বৃহত্তম শহর হাফাতে আঘাত করেছে। একটি আঘাত করেছে ইসরাইলের রাডার গাইডেড্ এ্যান্টিশীপ মিসাইল সি-৮০২ কে। অন্যদিকে হিবজুল্লাহ বাহিনী ৫০ জনের ছোট

ছোট দলে অত্যন্ত কাছাকাছি থেকে ধ্বংস করেছে ইসরাইলের ট্যাংক শহর! কিছুদুর ঢুকে পড়েছে ইসরাইলী শহর মেটালাতে। যুদ্ধের প্রথম দিকে হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০ জন। পরে তাদের সাথে যোগ দিয়েছে অসংখ্য রিজার্ভ ফোর্স। তারা তাদের যুদ্ধ পরিচালনা করেছে অসংখ্য বাংকার অথবা পাথুরে গুহা থেকে। হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের একে অপরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ছিল Encrypted ছোট ছোট Transmission, যা ইসরাইলের জ্যামিং এবং ইভ্সড্রপিং করার সামর্থের বাইরে ছিল।

এই অসম যুদ্ধ আরেকবার প্রমাণ করল যে, প্রথাগত যুদ্ধের বাইরে অনেক যুদ্ধ-কৌশল ও আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা সম্ভব যার মাধ্যমে একটি আপতক্ষুদ্র শক্তি একটি বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করতে পারে। ইসরাইল-হিজবুল্লাহর যুদ্ধে ইসরাইলী বাহিনী ভেরাসও রাশিয়ান বাহিনীর মতই শত্রুকে দুর্বল ভেবে অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী ছিল। তাদের চিরাচরিত যুদ্ধ কৌশল হিজবুল্লাহ যোদ্ধারা যুগ যুগ ধরে জানত। ফলে এর প্রতিষেধক যুদ্ধকৌশল বের করতে হিজবুল্লাহদের কোনরূপ বেগ পেতে হয়নি। একবিংশ শতাব্দীতে এসে Douhet এর Air Power Theory আজ প্রশ্নের সম্মুখীন এবং উদীয়মান চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ আজ স্থান করে নিচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট ও এর পারস্পারিক সংঘর্ষে।

প্রসংগ : বাংলাদেশের নিরাপত্তা

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের পরম হিতৈষী [!] লেখক বাংলাদেশের অনিরাপত্তা প্রসংগ উত্থাপনে ভারতীয় ভীতি উদ্রেকারী যে চিত্রটি তিনি নিম্নভাবে উপস্থাপন করেছেন তা এখানে সবিশেষভাবে চিন্তনীয়। তিনি বলেন :

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত ইদানিং যে সব গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হচ্ছে তাতে বাংলাদেশের **সম্ভাব্য বাংলাদেশের শত্রু ভারতের বিপরীতে বাংলাদেশে সামরিক শক্তিকে অতিশয় নগণ্য হিসেবে দেখিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে যে আদৌ বাংলাদেশের সামরিক শক্তির প্রয়োজন আছে কি না। অনেকে আরেকটু অগ্রসর হয়ে তিনি প্রস্তাব রাখছেন যে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব ভারতই নিশ্চিত করতে পারে, তাই বাংলাদেশের জন্য এতবড় সামরিক শক্তির প্রয়োজন নেই**। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তাদের এ ধরনের বায়বীয় জ্ঞানচর্চার সাথে বাস্তবের কোন মিল নেই। বরঞ্চ বাংলাদেশে আজ অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশ দিক থেকেই নিরাপত্তাহুমকিসহ নানাবিধ হুমকির সম্মুখীন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সীমান্ত এখনো অশান্ত। প্রতিদিন মানবিকতার মূল্যবোধকে সদর্পে পদদলিত করে ভারতের বি.এস.এফ. বাংলাদেশী নিধনে ব্যস্ত। সে সাথে কিছু ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের বাংলাদেশ আক্রমণ করে বাংলাদেশে ভারতীয় বিদ্রোহীদের ঘাঁটিসমূহ? উৎখাতের সদম্ভ হুংকার নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে আরো সাংঘর্ষিক করে তুলেছে। ভারতের যে কোন ধরণের অভ্যন্তরীন গোলযোগসহ বিভিন্ন বোমা আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় সে দেশের বুদ্ধিজীবীসহ সরকারী মহলের বাংলাদেশের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বুশ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাইসের সাথে বাংলাদেশের নিরাপত্তা সম্পর্কে তাদের আলোচনা, বাংলাদেশকে একটি ইসলামী মৌলবাদী দেশ হিসেবে ভারতের জোরালো প্রচারণাসহ বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি অকার্যকর রাষ্ট হিসেবে পরিচিতিকরণের আপ্রাণ চেষ্টা বাংলাদেশের জন্য অশনি সংকেতই বটে। এই অশনি সংকেত নিয়ে এখনো আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজ কেন বিচলিত নয় তা বিশ্লেষণের দায়িত্ব স্বাধীনতা প্রিয় সকল বাংলাদেশীদের বলে সূর্যশেখর লৌকিক মন্তব্য করেন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যখন বাংলাদেশে ভারতের জঙ্গিদের আশ্রয়ের বিরামহীন অভিযোগ তোলেন এবং ভারতীয় মিডিয়ায় বাংলাদেশ বিরোধী সমন্বিত প্রচারণা বাংলাদেশকে ক্রমাগতই ভারতের মুখোমুখি অবস্থানে ঠেলে দেয়, তখন নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্বের মাত্রা কি হতে পারে তা আর বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। এ ধরনের কার্যকলাপ কোনভাবেই ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের নিরপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষণ নয়। তাহলে এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি?" প্রশ্ন তোলে লেখক প্রবর কূটনৈতিক মুরুব্বীয়ানা দেখান।

উপসংহারে তিনি বাংলাদেশের প্রচার মিডিয়াতে প্রকাশিত সংবাদের উল্লেখ করে এদেশের মানুষের হত্যা, দুর্নীতি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি ইত্যাদির উদ্বেগজনক চিত্র পরিবেশন করে এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন যে ; "তাই জাতিকে এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তত করার দায়িত্ত আমাদের সবার। বর্তমান বিশ্বের সবল কর্তৃক দুর্বলের উপর এ অন্যায়ের উপাখ্যানের চরম সত্যকে যত দ্রুত হৃদয়ঙ্গম করা যায় ততই জাতির জন্য মঙ্গল ...." ইত্যাদি।

উপসংহারে প্রবন্ধের লেখক জনাব সূর্য শেখরকে ধন্যবাদ, বিশেষ করে এই কারণে যে এই ধরণের প্রবন্ধ ছাপানোটা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে ডেলিকেট হওয়া সত্বেও তিনি বড়ই বিচক্ষণতাবিধৃত চাণক্য সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, যা অবশ্যই সুভাবনার চেয়ে দুর্ভাবনার সৃষ্টিতে কম পারঙ্গম নয়!

www.pathagar.com

ঘ. বিশ্বপরিবেশে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

যুদ্ধ বিশ্বপরিবেশের ব্যাপক আকারে অপূরণীয় ক্ষতিও সাধন করে থাকে। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত যুদ্ধ-ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই ফুটে উঠে মানব-সৃষ্ট মানবতাবিধ্বংসী যুদ্ধ বিশ্বপরিবেশের কতই না মারাত্মক ধ্বংস সাধন প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। ১৯৯১ সালের ৯ই মার্চ মাসিক "দেশ"-এ সমরজিৎ কর এর "যুদ্ধ, পরিবেশ এবং সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধটির কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলেন, "পৃথিবী দিবসে" সারা পৃথিবীর মানুষ শপথ নেয় যে : সৌরজগতের পৃথিবী নামক এই নীলগ্রহটি সমস্ত মানুষের সম্পদ। তার পরিবেশকে সামগ্রিকভাবে সুসংহত রাখার দায়ও সমস্ত মানুষের উপর ন্যাস্ত। কিন্ত প্রলম্বিত সেই শপথ যে নিতান্তই অর্থহীন সেটা প্রমাণ করল ইরাক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে তৈরী বহুজাতিক সমরবাহিনীর যুদ্ধ। প্রাচীনকালে যুদ্ধরত সৈনিকদেরকে খাদ্যের জন্যে বনের পশুপাখির উপর নির্ভর করতে হত। নির্ভর করতে হত বনের ফলমূলের উপর। অরণ্য যোগাত তাদের আত্মগোপনের আশ্রয় (এখনো যোগায়)। শত্রুবাহিনীকে সেই আরণ্যক আশ্রয় এবং খাদ্য থেকে বঞ্চিত করতে পুড়িয়ে দেওয়া হত বনের পর বন। সুদুর অতীতে রাসায়নিক যুদ্ধের নজিরও পাওয়া যায়। প্রায় ৩০০০ বছর আগে আবিমেলেকের বিশাল এক বাহিনী শেচেম নামক একটি শহর আক্রমণ করে। শহরটি ছিল বর্তমান জর্ডানের নাবুলাস শহরের কাছাকাছি। সেই আক্রমণে শেচেম পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়। আবিমেলেকের বাহিনী ফিরে যাওয়ার সময় গোটা শহর এবং তার আশপাশের শস্যক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়ে যায় প্রচুর পরিমাণ লবণ। সেই লবণে ওই অঞ্চলের জলাশয়গুলির পানি এতই লবণাক্ত হয় যে তা পশুপাখিরও পান করার অযোগ্য হয়; মাটিতে লবণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় দীর্ঘকাল চাষবাস করাও সম্ভব হয়নি।

প্রসংগ : ইরাক-কুয়েত-যুদ্ধ : তিনি (১৯৬৪) ইরাক কুয়েতের যুদ্ধে বিপর্যস্ত পরিবেশের তথ্য পরিবেশন করতে গিয়ে বলেন যে এই যুদ্ধে ইরাক ধ্বংস করে দেয় কুয়েতের একাধিক তৈলাধার। তৈলক্ষেত্রগুলিতে ধরিয়ে দেওয়া হয় আগুন। এসব আগুনে লক্ষ লক্ষ ব্যারেল তেল পুড়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোকাসাইড, হাইড্রোকার্বনস, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেনের অকসাইড তৈরী হয়। যা মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে ছড়িয়ে পড়ে । বিষাক্ত করে তোলে ওই অঞ্চলের বাতাস। এ ছাড়াও লক্ষ লক্ষ ব্যারেল তেল সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেই তেল অনতিকালের মধ্যে উপকূলবর্তী অঞ্চলের সমুদ্রের জলকে করে দুষিত।

www.pathagar.com

তার আস্তরণে ঢাকা পড়ে মাইলের পর মাইল জল এলাকা। তেলে ঢাকা জলে মাছ শিকার করতে গিয়ে মারা পড়ে শত শত ভ্রাম্যমাণ পাখি। ওই অঞ্চলের জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণীর উপরও তা মরণঘাতী হয়ে উঠে। এই দূষিত তেল মধ্য ভারতের পশ্চিম উপকূলে এসে পৌছবে। দূষিত করবে আমাদের সামুদ্রিক পরিবেশ।

ইরাকের পাল্টা অভিযোগ, তৈলাধারগুলি ধ্বংস করেছে মার্কিনবাহিনী। যুদ্ধবাজ মার্কিন দেশের অভিযোগ, আসলে সেকাজটি ইরাকই করেছে। শত্রুপক্ষের নৌবাহিনীকে বিপর্যস্ত করতেই এটা করা। রণকৌশলের জন্যে হয়ত তার প্রয়োজন ছিল। যা হোক এই ঘটনা আবার এটা প্রমাণ করল, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। যুদ্ধের সঙ্গে কোনভাবে যুক্ত নয় যারা, তাদের উপরও তা বর্তায়। ফলে যুদ্ধের তাৎক্ষণিক লাভের প্রয়োজনে বিধ্বস্ত হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। অতীতেও যেমন, আজও যেন তাতে ভাটা পড়েনি।

প্রসংগ : অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের প্রভাব : তিনি আরো উল্লেখ করেন : যুদ্ধ হচ্ছে একই দেশের অভ্যন্তরে একপক্ষে জাতীয় সেনাবাহিনী, অপরপক্ষে দেশের জাতীয় বা মুক্তিবাহিনী, অথবা গেরিলা বিদ্রোহী। এ ধরণের যুদ্ধে রণকৌশল হিসেবে পরিবেশজনিত সুযোসুবিধার ভূমিকা অনেক বেশী। আকর্ষণীয়। যুদ্ধের প্রাধানতম উপকরণ হিসেবে পরিবেশজনিত সুবিধে কাজে লাগানর ফলে খরচও কম হয়। এ ধরনের যুদ্ধে প্রতিপক্ষরা (বিদ্রোহী বা জাতীয়তাবাদি ফৌজ) যুদ্ধকলায় তেমন পারদর্শী না হলেও অনুকূল পরিবেশে যুদ্ধ চালাতে তেমন বেগ পায় না। ঘন বন, পর্বতকন্দর এবং দুর্ভেদ্য এলাকায় আত্মগোপন করে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তারা চালিয়ে যেতে পারে সংগ্রাম।

দৃষ্টান্ত : পৃথিবীর বহু অঞ্চলে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ শিকার হয়েছে অরণ্য এবং প্রাণিকুল। লেবাননের ঘন সেডার অরণ্য একদা ইতিহাসেও ছিল শিরোনাম। কিন্তু সেখানেও চলছে যুদ্ধ। অরণ্যে সৈনিকদের গোপন আস্তানা গড়তে গিয়ে এবং সৈনিক এবং অসামরিক নাগরিকদের জ্বালানি সংগ্রহের চাপে মনোরম সেই সেডার অরণ্যকে এখন যেন চোখে দেখা যায় না, এতই নিষ্প্রভ। শান এবং কারেন অধ্যুষিত এলাকা এক সময় ছিল সেগুনের স্বর্গরাজ্য। পৃথিবীর ৮০ শতাংশ সেগুন গাছ এই অঞ্চলেই জন্মাত। কিন্তু মিয়ানমার বা বর্মার দখলদারি বাহিনী এবং কারেন ও শানের প্রতিরোধ বাহিনীর মধ্যে শুরু হয় যুদ্ধ। দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে উভয় দলের সৈনিকদের তক্তা যোগাতে গিয়ে সেই

www.pathagar.com

সব গভীর সেগুনবন এখন প্রায় নিঃশেষ। বর্মার সরকারি সেনারা কারেন এবং শানদের বহু শস্যক্ষেত্র এবং বন্য পশুপাখির আবাস পুড়িয়ে দিয়েছে।

আগুন জ্বালিয়ে শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করাটাও এক ধরণের সামরিক কৌশল। এই কৌশলটি কাজে লাগান হয়েছিল আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে। কেনিয়ায় মাউ মাউ বিদ্রোহীদের দমন করতে (১৯৫০-৫৬) ব্রিটিশ বাহিনীরাও এই কৌশল কাজে লাগায়। ফরাসী কর্তৃক আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দমন (১৯৫০-৫৬) এবং সোভিয়েত দেশ কর্তৃক আফগানিস্তানে মুজাহেদিন সম্প্রদায়কে রুখতে (১৯৭৯-৮৯) এ ধরনের রণকৌশল খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। এর ফলে লক্ষ লক্ষ অরণ্য নির্মূল হয়েছে, বিনষ্ট হয়েছে লক্ষ লক্ষ হেক্টর চাষের জমি। প্রবন্ধকার ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রসংগ টেনে উল্লেখ করেন, এই যুদ্ধে মার্কিন সেনারা দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রায় ৩০ শতাংশ অঞ্চল বোমা এবং শেলের আঘাতে বিপর্যস্ত করে তোলে। যুদ্ধের পর গোটা অঞ্চলটাই হয়ে দাঁড়ায় চাঁদের পিঠের মত অজস্র খাদে ভরা। বোমা এবং শেলের আঘাতে তৈরী হয়েছে ছোটবড় মিলিয়ে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ খাদ। বিমান থেকে দেশের ১০ শতাংশ জমির উপর ছড়ান হয় আগাছা ধ্বংসকারী বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগ। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় হার্বিসাইডস। এই রাসায়নিক যৌগ সেদেশের ৮ শতাংশ শস্যক্ষেত্র, ১৪ শতাংশ অরণ্য এবং ৫০ শতাংশ ম্যানগ্রোভস্ বা লবণাক্ত উদ্ভিদ ধ্বংস করেছে। "রোম প্লাউ" নামে অতিকায় বুলডোজার জাহাজের নোঙর বাঁধার শেকল নিশ্চিহ্ন করেছে প্রচুর গাছপালা। বিনষ্ট হয়েছে ব্যাপক অঞ্চলের তৃণভূমি। যুদ্ধের ফলে উন্মুক্ত হয়েছে মাটি। যার ফলশ্রুতি মৃত্তিকার নিয়মিত অবক্ষয় এবং ধুলিঝড়। পানীয় জলের উৎসগুলি হয়েছে ব্যবহার অযোগ্য; উপকূলবর্তী এলাকায় মাছ কমেছে, বিলুপ্ত হয়েছে নানা রকম বন্য পশুপাখি। অরণ্য নেই। অতএব তাদের আশ্রয়ও নেই। মার্কিন বোমা এবং বুলডোজার নিশ্চিহ্ন করেছে হাজার হাজার হেক্টর মূল্যবান ঘাস ইমপেরেটা সিলিনড্রিজার বীথি, ইঁদুর, খরগোস প্রভৃতি প্রাণী। বোমার আঘাতে তৈরি ছোটবড় খাদগুলিতে এখন পঁচা জল–মশার স্বর্গ। ফলে ভিয়েতনামে ম্যালেরিয়া এখন মহামারী।

ঙ. যুদ্ধের প্রস্তুতিতে পরিবেশ দুষণ

একটি যুদ্ধের আয়োজনে বা এর প্রস্তুতিতে ভারসাম্য প্রাকৃতিক পরিবেশের যে সমূহবিপর্যয় ঘটে এর একটি প্রাঞ্জল বর্ণনা দিতে গিয়ে সমরজিৎ বলেন : যুদ্ধই যে

শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করে তা নয়, যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং উপকরণ উদ্ভাবনা করতে গিয়েও যে কতভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা হচ্ছে তারও উদাহরণ বড় কম নয়। যুদ্ধের তাগিদে চলে কতরকমই না প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণের মধ্যে থাকে বোমাবর্ষণ, বন্দুক কামান প্রভৃতি থেকে গুলি ছুঁড়ে কল্পিত লক্ষ্যস্থলকে ধ্বংস করা, কৃত্রিম অগ্নিকাণ্ড এবং ধুম্রজাল সৃষ্টি করে যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করে অস্ত্রচালনা শিক্ষা, কৃত্রিম গ্যাসযুদ্ধ, যুদ্ধকালীন জঞ্জাল নিকাশি, বনজঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে রণকৌশল অনুশীলন। এমন প্রশিক্ষণের উদ্যোগ পরিবেশের ক্ষতি করে। তবে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা। পরমাণু বোমার ধ্বংসক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য নির্বাচিত করা হয় প্রত্যন্ত অঞ্চল। যেখানে মানুষের গমনাগমন নেই বললেই চলে। মানুষের হাত না পড়ায় এইসব অঞ্চলের প্রাণী এবং উদ্ভিদকুল আবহমানকাল ধরে নিরাপদে বাস করে আসছিল। হাজার হাজার বছর ধরে সেখানকার প্রাণী এবং উদ্ভিদ, ভূগর্ভস্ত জলসম্পদ দুষণমুক্ত অবস্থায় বিরাজিত। এ ধরনের অঞ্চলই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে পরমাণু বোমা পরীক্ষার ক্ষেত্র। যেমন : নেভাডা মরুভূমি। ১৯৬৩ থেকে এই মরুভূমিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেন পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ৬৭০টি পরমাণু বোমার। ওই একই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন তৈরী করেছে উচ্চ তেজস্ক্রিয়সম্পন্ন পারমাণবিক জঞ্জাল নিকাশি ব্যবস্থা। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৮-র মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরের বিকিনি এবং এনেভেটক প্রবালদ্বীপে ৬৬টি পরমাণু এবং হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামুলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এ ছাড়াও ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২-র মধ্যে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরের ক্রিষ্টমাস দ্বীপে ৩৪টি পরমাণু এবং হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। ব্রিটেন অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পশ্চিম এবং মধ্য অঞ্চলে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ঘটিয়েছে ১২টি পারমাণবিক বিস্ফোরণ। ফ্রান্স ১৯৬২-র পর থেকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের মরুরো এবং ফাংগাতুয়াফা প্রবালদ্বীপে মোট ১৩২ টি পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। মরুর বিস্ফোরণ সেখানে সৃষ্টি করেছে বিরাট এক ফাটল, যা আধ মাইল লম্বা, আট ইঞ্চি চওড়া । দ্বীপটির বিরাট অংশ বিচূর্ণ হয়েছে। এই ধ্বংসের পর এই অঞ্চলে কয়েকটি এককোষী প্রাণীর দ্রুত গতিতে বংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। তাদের নিক্ষিপ্ত বিষের স্পর্শে মারা যাচ্ছে নানা রকম মাছ। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নানা রকম প্রাণী ও উদ্ভিদ। প্রশ্ন : এই যে ক্ষতি, এর নৈতিক দায়িত্ব কার?

উপসংহারে তিনি ব্যাংগ করে বলেন : আমরা "পৃথিবী দিবস" পালন করছি। মনে হয় না এটা একটা বিরাট ভণ্ডামী!

www.pathagar.com

চ. কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প : গ্যাসচেম্বারে হত্যা

এই প্রসংগে এডলফ হিটলারের গ্যাসচেম্বারে নিরীহ বন্দীদেরকে হত্যার চিত্রটি সবিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। The people of Germany are the chosen people sent down to the earth to rule the world but not to be ruled by any people.জার্মানদের এই অহমিকা ও দম্ভ কায়েম করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জার্মানির জিংগোয়িস্ট শাসক হিটলারের নির্দেশে "বন্দীদের কনভয়গুলো" গ্যাস চেম্বারের ১০০ মিটার দুরে থামানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে কনভয় বহনকারী কারগুলো হতে বিপুল সংখ্যক জার্মান সৈন্য অবতরণ করে। তারা কনভয় থেকে অসংখ্য নর-নারী শিশুকে বের করে আনে। বয়স্ক স্ত্রীকে স্বামী থেকে, যুবতীদেরকে মা-এর নিকট থেকে আলাদা করে মা ও সন্তানদের গ্যাস চেম্বারে পাঠান হয়। এরা সবাই জানতোনা যে তাদের জন্য বিভীষিকাময় মৃত্যু অত্যাসন্ন। তাদের বিমূঢ় ভাব অপনোদন করার জন্য কর্তৃপক্ষ কৃত্রিম অভ্যর্থনার আয়োজন করে। খাটো সাদা ব্লাউজ ও নেভী ব্লু স্কার্ট পরিহিতা সুন্দরী তরুনীরা অর্কেষ্ট্রার সংগীতময় পরিবেশে "The merry widow", "The Barcarolle" ইত্যাদি মনমুগ্ধকর সংগীত পরিবেশন করছিল তখন। হতভাগা বন্দীদেরকে নিরুদ্বিগ্ন করার জন্য জানানো হল যে তাদেরকে "শ্রম শিবির" নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গ্যাস চেম্বারে পৌছানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তারা প্রস্ফুটিত বিভিন্ন ফুলের চারায় পরিবেষ্টিত একটি প্লাট ফর্মে পৌছার পর পরই সম্মুখে দেখতে পেল লাল ইটে নির্মিত একটি ভবন। এর দেয়ালে লিখা Baden অর্থাৎ Baths : হাম্মামখানা। এখানে পৌছা মাত্রই ভাগ্যবিড়ম্বিত বন্দীদেরকে উলঙ্গ করা হল অনেকটা শক্তি প্রয়োগে এবং তাদের প্রত্যেককে একটি করে তোয়ালে দেয়া হল– এরা যেন গোসলখানায় 'শাওয়ার'-এ গোসলের জন্য প্রবেশ করে। সর্বশেষ কনভয়টি যখন হাঙ্গেরী থেকে পৌছল তখনই এই সব হতভাগা বন্দীর সবাইকে ঐ ভবনের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়ে ভবনের ছাদের ফোকর দিয়ে 'গ্যাস ক্যাপস্যুল' ছুড়ে ফেলা হল। ৫/৭ মিনিটের মধ্যে এই সব ক্যাপ্সুল বিস্ফোরিত হয়ে বিষাক্ত ধূম্র কুন্ডলী সৃষ্টি করল। ফলে সব বন্দীই তপড়াতে তপড়াতে নিমেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। দেখা গেল, মৃত্যুযাতনা থেকে পরিত্রাণের ব্যর্থ চেষ্টায় একজন অপরজনকে এমন ভাবে আঁকড়িয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল যে তাদের মৃতদেহগুলোর পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করাটা খুবই ক্লেশকর ছিল। উল্লেখ্য, এভাবে মৃত্যুপথ যাত্রীদের একজন লিটল মারিয়া (Little

www.pathagar.com

Marie) সৌভাগ্যবশতঃ বেঁচে গিয়েছিল। তাঁর এহেন জীবন রক্ষায় "হিটলারের গ্যাস চেম্বার -কাহিনী" আজ তাঁরই স্মৃতিমন্থনে আমাদের নিকট ইতিহাস হয়ে রয়েছে–২য় বিশ্বযুদ্ধের কলংক-তিলক হিসাবে, তথাকথিত সভ্যতার "যুদ্ধ" অভিশাপ হিসাবে। [From Tyranny on Trial by Whitnoy R. Harris ... Soothen Methodist Univ. press, Dallas, 1954).

ছ. যুদ্ধবন্দীদের প্রতি পরাশক্তির আচরণ : কতিপয় দৃষ্টান্ত

মোটামুটি গ্যাস চেম্বারের হত্যাকাহিনীর নিরিখে আধুনিক বিশ্বের যুদ্ধ, এর প্রকৃতি ও বিপর্যয় আমাদের এই আবাসভূমি পৃথিবীকে সম্প্রতি কি উপহার দিয়ে যাচ্ছে এর কতিপয় দিক নিম্নে উল্লেখ করা হল। "যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি পরাশক্তিগুলোর আচরণ" –এ প্রসংগের আংগিকে বিগত ৪ঠা আগষ্ট,২০০৬ সালে প্রকাশিত সংবাদটির প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক। হাদিসায় মেরিন সেনাদের দ্বারা নিরীহ নাগরিকদেরকে হত্যা করা হয়েছে। মার্কিন সামরিক তদন্তে দেখা গেছে যে মার্কিন মেরিন সেনারা ইরাকের তকরিতের কাছে হাদিসা গ্রামে নারী ও শিশুসহ ২৪ জন অসামরিক নাগরিককে ইচ্ছাকৃতভাবে গুলি ও গ্রেনেড ছুঁড়ে হত্যা করেছে। পেন্টাগণের এক কর্মকর্তার বরাতে এ খবর এপির। এর তদন্তে নেতৃত্ব দিয়েছে ন্যাভাল ক্রি মিনাদে ইনভেস্টিগেশন সার্ভিস।

ইরাকে এ যাবৎ বিনা কারণে হত্যাকাণ্ডের যতোগুলি ঘটনার অভিযোগ উঠেছে ইরাকে হাদিসার হত্যাকাণ্ড সেগুলির অন্যতম। ৩ থেকে ৪ হাজার পৃষ্ঠার এই তদন্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে উক্ত তথ্য প্রদান করেছেন মার্কিন শীর্ষস্থনীয় আধিনায়ক জেনারেল জর্জ ক্যাটস।

বিগত ৯/৮/০৬ তারিখে প্রকাশিত আর একটি সংবাদে এক ইরাকী কিশোরীকে ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের যে লোমহর্ষক বর্ণনা রয়েছে তা-ও অনুধাবনীয়। এথেকে সহজে আঁচ করা যায় "সভ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র" এর সামরিক অভিযানে বিশ্ব মানবতার প্রতি কী বীভৎস দৃষ্টান্তই না স্থাপন করে যাচ্ছে। সাংবাদটির হুবহু উদ্ধৃতি এই :

বাগদাদ থেকে ইসলাম অনলাইনে প্রকাশিত সংবাদটিতে বিবৃত করা হয় যে, কয়েকজন কুখ্যাত মার্কিনসেনা কর্তৃক এক ইরাকী কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের বিষয়ে এক সোমবার বাগদাদের একটি মার্কিন সামরিক আদালতে লোমহর্ষক ও লিখিত স্বীকারোক্তিমূলক শুনানি হয়েছে। শুনানিতে বলা হয়,

www.pathagar.com

ধর্ষণের পর সৈন্যরা ঐ কিশোরী এবং ৫ বছরের একটি শিশুসহ রিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে হত্যা করেছে। বার্তাসংস্থা এএফপি জানায়, তাদের একজনের স্বীকারোক্তিতে বিশেষজ্ঞ জেমস সরকার বলেছে যে বাগদাদের দক্ষিণের একটি চেকপয়েন্টে ১২ জন মার্কিন সৈন্য এনার্জি ড্রিংক মিশিয়ে হুইস্কি পান করে গলফ খেলছিল। তার লিখিত স্বীকারোক্তি মোতাবেক, হঠাৎ করে সৈন্যদের একজন বিশেষজ্ঞ স্টিভেন গ্রীনসকে (২০) বলল সে কিছু ইরাকীকে হত্যা করারার জন্য বাইরে যেতে চায়। তার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে অভিযুক্ত চারজন বার্কার সার্জেন্ট পল, কোরটেজ, ব্রায়ান হাওয়ার্ড, জেসে স্পিয়েলম্যান কালো সিল্কের প্যান্টও মুখোশ পড়ে নিকটবর্তী একটি বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। একটি রেডিও হাতে নিয়ে তদারকির জন্য একজন ঘরের বাইরে অবস্থান করে। অপরদিকে অন্যান্যরা দলবদ্ধভাবে গৃহের ভেতরে প্রবেশ করে। ঘরের ভেতর পরিবারটির ৪ জন সদস্য ছিল।

এরা কোর্টেজ আবীর কাসিম হামজা আল-জানাবি নামে ১৪ বছরের কিশোরীকে জোরপূর্বক মেঝেতে ফেলে ধর্ষণ করে। কিশোরিটি নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। বারকার বলেছে, একে একে সবাই ধর্ষণ করার পর সেও ধর্ষণ করার জন্য কোর্টেজের সাথে অবস্থান নেয়। তবে সে বলেছে, সে ধর্ষণ করেছে কি না এ বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়। ইতোমধ্যে গ্রীন্স কিশোরীটির পিতা-মাতা ও ৫ বছরের বোনকে অপর একটি কক্ষে নিয়ে যায়। স্বীকারোক্তিতে বলা হয়, ঐ কক্ষে গুলীর শব্দ শোনা যায়। গ্রীনস সে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে বলে, 'সবাইকে মেরে ফেলেছি।' অতঃপর গ্রীনস তার পালানুযায়ী ইরাকী কিশোরীকে ধর্ষণ করার পর একটি একে-৪৭ রাইফেল দিয়ে তাকে হত্যা করে।

তার লিখিত স্বীকারোক্তিতে বারাকারা বলেছে, হত্যার পর কিশোরীর উপর কোরেসিন ঢালা হলে কে যেন তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটার দরুণ গ্রীনসকে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। যা হোক, ইরাকের বিভিন্ন কারাগারে আমেরীকার সৈন্যরা যে নির্যাতন অদ্যাবধি চালিয়ে যাচ্ছে এর সার চিত্রটি নিম্নরূপ :

১. বন্দীদেরকে গলায় রশি বেঁধে মৃত জানোয়ারের ন্যায় টানাহেঁচড়া করা
২. বন্দীদেরকে উলঙ্গ করে হাত পিছনে বেঁধে হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দেয়া
৩. বন্দীদের শরীরে পেশাব করে দেয়া

www.pathagar.com

৪. নির্মমভাবে মারপিট করে অন্ধকার কুঠরিতে পানি ঢেলে দিয়ে তার উপর হাত পা বেঁধে উপুড় করে শুইয়ে রাখা

৫. বন্দীদেরকে উলঙ্গ করে তাদের পিঠ দিয়ে পিরামিড তৈরী করা

৬. পুরুষ বন্দীদেরকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে তাদের সামনে মহিলা বন্দীদেরকে খাবার পরিবেশনে বাধ্য করা

৭. মুসলমান বন্দীদেরকে শুকরের মাংস ও মদ খেতে বাধ্য করা

৮. পৈশাচিকভাবে যৌন নির্যাতন করা

৯. বন্দীদেরকে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে মৃত লাশের অবমাননা করা ও লাশ নিয়ে হাসি তামাশা করা, ইত্যাদি।

জনৈক বন্দীর আর্তিটিও লক্ষণীয় : "তোমরা আমাদেরকে কারাবন্দীর মর্যাদা না দাও, অন্তত তোমাদের ঐ কুকুরটির সমান মর্যদা দাও।" কিন্তু আমেরিকার সৈন্যরা তা দিতেও অস্বীকৃত জানিয়েছে।

বিগত ৭/৮/০৬ তারিখে প্রকাশিত সংবাদের ঘটনাটি স্মর্তব্য : সি.আই.এর সাথে চুক্তিবদ্ধ একজন কর্মী আফগান বন্দীকে এমনভাবে প্রহার করেছে যে, যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সে ঐ কর্মীকে গুলী করার মিনতি করেছে। বিচার কাজের শুরুতে আইনজীবীরা একথা জানায়। সাবেক বিশেষ বাহিনীর চিকিৎসক মি. ডেভিড প্যাসারো চুক্তির অধীনে সিআই এর সাথে কাজ করছেন। প্যাসারো হচ্ছেন সর্বপ্রথম বেসামরিক কর্মকর্তা যার বিরুদ্ধে বন্দী নির্যাতনের অভিযোগ আনা আইনজীবী মাইকের সুলিভান এক প্রারম্ভিক বিবৃতিতে বলেন, প্যাসারো টানা দু'রাত আব্দুল ওয়ালীকে নির্মমভাবে প্রহার করে। এর ফলে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ওয়ালী তাকে গুলী করে মেরে ফেলার জন্য কাবারক্ষীদেরকে অনুরোধ করে। নির্যাতনে আহত হয়ে ওয়ালী অবশেষে মারা যায়।

সুলিভান বলেন, এক পর্যায়ে প্যাসারো ওয়ালীকে দাঁড় করিয়ে এমনভাবে লাথি মারল যেন সে ফুটবল খেলছে। তার লাথির আঘাতে ওয়ালী উড়ে গিয়ে পড়ল। তিনি বলেন ওয়ালীকে এমনভাবে আঘাত করা হল যে এতে তার প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়।

লক্ষণীয়, বন্দি নির্যাতনের অপরাধে সম্প্রতি সামরিক বাহিনীর কিছু কিছু সেনাকে শাস্তি দেয়া হয় বটে, তবে এই শাস্তিপ্রাপ্তদের ও তাদের পরিবারের প্রতিক্রিয়াটি ও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কারণ এতে মানবতা অপেক্ষা নিরেট আদেশ পালনের যে চিত্রটি ফুটে উঠে তা কিছুতেই মানবীয় হতে পারে না। যেমন :

www.pathagar.com

জ. চালর্স গ্রেনারের দশ বছর কারাদন্ডে মাতা ইরমার মন্তব্য

ইরাকের রাজধানী বাগদাদের উপকণ্ঠে আবু গারিব কারাগারে ইরাকী বন্দীদের ওপর চরম অমানবিক এবং যৌন অবমাননা ও লাঞ্ছনামূলক অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে মার্কিন সামরিক পুলিশ কর্মকর্তা ও ইরাকের মার্কিন সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন আবু গারির করাগারের সাবেক কর্মকর্তা কর্পোরেল চার্লস গ্রেনারকে ১০ বছর কারাদন্ডে দণ্ডিত কর হয়। বিগত ১৬/১/০৬ তারিখে রবিবার টেক্সাসের কোর্টহুড সেনানিবাসে দশ সদস্যের সামরিক আদালতের রায়ে গ্রেনারের এই সাজা প্রদান করা হয়। সাজা প্রদানের পর তিনি বলেন, আমি শুধু সামরিক নির্দেশই পালন করেছি। বিচারে ঐ কারাগারের বন্দীদের ওপর জঘন্য এই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের রিংলিডার বা দলপতি সাব্যস্ত করা হয় গ্রেনারকে। সামররিক আদালত একই সাথে তাকে মার্কিন সেনাবাহিনী থেকে অসম্মানজনক বরখাস্তের আদেশও প্রদান করে। বিবিসি, স্কাই নিউজ, সি এন এন জানায়, বিচারে তাকে একজন ধর্ষকামমূলক এবং দুর্বলের নিপীড়ক হিসাবে চিত্রিত করা হয়। অন্তত দশটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং এসবের পক্ষে প্রামাণ্য আলোকচিত্রও তুলে ধরা হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনে গ্রেনার বলেন, তিনি কেবল নির্দেশ পালন করে বন্দীদের কিছুটা 'কাবু' করার চেষ্টা করেছিলেন। আদালতে ক্ষমা প্রার্থনাও করেছিলেন গ্রেনার। গ্রেনারের মাতা ইরমা সাংবাদিকদের কাছে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, আমার ছেলে তো দৈত্য বা দানব নয়, যদি সেরকম কিছু ঘটেই থাকে তবে তাকে সে রকম কিছু বানানো হয়েছে। তিনি বার বার বলছিলেন, এর দায়-দায়িত্ব মার্কিন বাহিনীর উপরের দিকের নেতৃত্বের ওপরই বর্তায়।

ঝ. চীনে মানবিক চেতনার উন্মেষ

চীন সরকার দেশটির নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য সম্প্রতি বন্দী নির্যাতন সংক্রান্ত আইন সংশোধন করে সুনির্দিষ্ট কিছু ধারা সংযোজিত করেছে। এ ধারাগুলোর বাস্তবায়ন শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই করতে পারবে। চীনের একটি সরকারী ওয়েবসাইটে বন্দী নির্যাতন আইন সংশোধন বিষয়ক এধারাগুলো প্রচার করা হয়। কারাবন্দীদের মানবাধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংশোধিত এ আইনের নতুন ধারাগুলোতে বন্দীদের প্রহার এবং অনশনে বাধ্য করা যাবে না বলে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

এ নতুন নিয়মের আওতায় বন্দীদের নির্যাতনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা অনুসরণ করা হবে। ফলে বন্দীরা পাশবিক নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পাবে। আগে বন্দীদের ওপর পাশবিক নির্যাতনের জন্য পুলিশ বা সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামালা দায়েরসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হতো না। এ নতুন সংশোধিত আইনের আওতায় কোন পুলিশ বা সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নির্যাতনে কোন বন্দী আহত বা নিহত হলে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করাসহ উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে।

ঞ. শেখ ইউসুফ আলীর পণবন্দী হত্যা প্রসংঙ্গে ফতোয়া

এ প্রসঙ্গে পণবন্দী হত্যার ক্ষেত্রে ইসলামের ঘোষণা কি এর সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত দিয়েই এই পরিচ্ছেদের ইতি টানছি। সম্প্রতি পণবন্দী করে দাবী আদায়ের এক জঘন্য মানসিক প্রবণতা কাপুরুষোচিত হত্যাযজ্ঞের সূচনা করেছে। ইসলামে এ ধরনের কোন কৌশলের সমর্থন থাক দুরের কথা অনুমোদনই নাই। আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুফতী জনাব শেখ ইউসুফ আর কারযাবীর এতসংক্রান্ত বিষয়ে প্রদত্ত এক ফতোয়ায় তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ফতোয়াতে তিনি যা উল্লেখ করেন তা নিম্নে শ্রেণীবিন্যাস করে উল্লেখ করা হল :

১. পণবন্দীর সাথে কারাবন্দীদের ন্যায় ভাল ব্যবহার করতে হবে।
২. পণবন্দীর ব্যাপারে সরকারী বিচার বিভাগই সিদ্ধান্ত নেয়ার একমাত্র বৈধ কর্তৃপক্ষ। ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ এই অধিকার দিয়ে থাকে।
৩. পণবন্দী করা অন্যদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের নামান্তর; এই পণবন্দী মুসলিম অমুসলিম যে-ই হোকনা কেন।
৪. পণবন্দীকে একজন কারাবন্দী হিসাবে গণ্য করতে হবে।
৫. পণবন্দীকে হত্যা এক ধরণের পাপ।

[বিগত ১০/১০/০৪ ইং তারিখে আল জাজিরা স্যাটেলাইট টেলিভিশনে এক সাক্ষাতকারে জনাব শেখ ইউসুফ আলী ইরাকে পণবন্দী প্রসংগে উক্ত ফতোয়া প্রদান করেন।]

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইসলামে যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি

ক. ইসলামে যুদ্ধ : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

প্রথম অধ্যায়ে 'আধুনিক যুদ্ধ' ও এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে এই অধ্যায়টি সবিশেষভাবে অনুধাবনীয়। "ইসলামে যুদ্ধ ও বিশ্বশন্তি" প্রবন্ধের মূল বিষয়ে প্রবেশ করার পূর্বে সূচনাতে "ইসলাম" ও "যুদ্ধ" এই দুটি পরিভাষার ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বিশেষ করে পবিত্র কালেমা তাইয়্যাবার প্রথমাংশ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর আংগিকে। এই অংশে "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই" ঘোষণার মাধ্যমে জীবন ও জগতের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা কায়েম করা হয়েছে। তাই পবিত্র কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত ও সিরাত ইবনে হিশামের আলোকে প্রথমেই মানব ও জ্বীন জাতিকে আল্লাহ পাক এই জ্ঞান ও প্রত্যয় দিচ্ছেন যে :

আল্লাহপাক দুনিয়া ও এর সমস্ত সৃষ্টিকুলের মালিক সেহেতু তিনিই হচ্ছেন গোটা বিশ্বের একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার প্রভু।

তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। উদ্দেশ্য : মানুষ তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর আদেশ-নির্দেশ মোতাবেক বিশ্ব পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে। মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আ.), এবং সব মানুষই হযরত আদমের অধঃস্তন পুরুষ। সে হিসাবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বংশ-ভাষা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের ধন, মান,প্রাণ পবিত্র ও মর্যাদাভিষিক্ত। প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষ আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান 'ইসলাম' অনুসরণে জীবনযাপন করবে। ইসলামের অনুসরণ অর্থ হচ্ছে "আল্লাহর আদেশ-নিষেধের কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে সমর্পণ করা"। এভাবে যখন কোন মানুষ সচেতনভাবে পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন ও

www.pathagar.com

আত্মসমর্পণ করে, তখনই সে 'মুসলমান' হিসাবে সম্মানিত ও পরিচিত হয়। তার পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহপাক ঘোষণা করেন : "ওহে তোমারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহর সাথে চুক্তি রক্ষাকারী হও (আল্লাহর জন্যে দৃঢ় পদে অধিষ্ঠিত থাকো) পরিচ্ছন্ন আচরণের সাক্ষ্য হিসাবে এবং অন্যদের ঘৃণা তোমাদেরকে অন্যায় করার জন্য বিচ্যুত (Swerve) না করে, এবং ন্যায় হতে সরিয়ে না নেয়। ন্যায়পর হও যা তোমাদের দায়িত্বের অতি নিকটে এবং আল্লাহকে ভয় করো। কারণ তোমরা যা করো আল্লাহ (তা সম্পর্কে) সুপরিজ্ঞাত।" (মায়েদা : ৮)

মুসলমান হওয়ার পথে বা মুসলমান হিসাবে জীবনযাপনের পথে যারা বাধা সৃষ্টি করে, প্রাণনাশের হুমকি দেয় ও আক্রমণ চালায় তাদের বিরুদ্ধেই ইসলাম যুদ্ধ করার নির্দেশ প্রথম প্রদান করে। আল্লাহর রাসূল (দঃ) এর মক্কা জীবন থেকে মদীনার জীবনে ব্যষ্টিক ও সামগ্রিক জীবন "ইসলামে যুদ্ধ ও শান্তির" পূর্ণ স্বচ্ছ ও বাস্তব দৃষ্টান্ত।

এবার "যুদ্ধ" সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। যুদ্ধের আরবী হচ্ছে হারব্ (   )। ইসলামে এই শব্দটির অর্থ জ্বিহাদ (   ) শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। জ্বিহাদ শব্দের মধ্যে "যুদ্ধ নয় বরং কল্যাণের উদ্দেশ্যে অকল্যাণ মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।" পরিভাষা হিসাবে এই ভাবটি জ্বিহাদ শব্দের মধ্যে বিধৃত। জ্বিহাদ প্রধানত দু' কারণে উদ্ভব হয় :

১. নিজের 'হক' নষ্ট করতে চাইলে নিজে বা অন্য কারো দ্বারা

২. খোদাদ্রোহী স্বৈরাচারী শক্তির মোকাবেলা এবং ধ্বংস করার চেষ্টাকালে

ইসলামী বিশ্বকোষের দৃষ্টিতে : জ্বিহাদ মূল শব্দ জিহদ্ ধাতু হতে উৎপন্ন। এর অর্থ হচ্ছে চেষ্টা বা পরিশ্রম করা। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা বা সংগ্রাম করা। এই চেষ্টা নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধতা থেকে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করা পর্যন্ত নানা আংগিকে বিস্তৃত। সুতরাং জ্বিহাদ বলতে উদাহরণস্বরূপ হরিজনদের নেতা মহাত্মা (?) গান্ধীর "অমুসলিম, কাফের নিধনযজ্ঞ" এর মত বিকৃত ও বিদ্বেষপূর্ণ অর্থ বুঝায় না। বরং ব্যক্তিগত অত্যাচার-অবিচার তথা খোদাদ্রোহিতার উৎখাত সাধনে সচেষ্ট থাকা বুঝায়, এবং এই প্রেক্ষাপটে 'জ্বিহাদ' হচ্ছে একটি পূত-পবিত্র বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের অমোঘ নির্দেশবিষয়ক পরিভাষা।

www.pathagar.com

হাদীস শরীফের আলোকে এই কথাটি নিম্নভাবে ব্যক্ত করা যায় :

১. উত্তম জ্বিহাদ হচ্ছে নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জ্বিহাদ বা উত্তম প্রচেষ্টা। এটি সর্ব শ্রেষ্ঠ জ্বিহাদ।

২. দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক পরিবেশে বিরাজমান অন্যায় বা অশ্লীলতার বিরুদ্ধে জ্বিহাদ। এটি সাধারণ অর্থে জ্বিহাদ।

উল্লেখ্য, কিতাবুছ সীয়ার বা যুদ্ধনীতির উপর লিখিত 'হেদায়া' গ্রন্থে জ্বিহাদের প্রসংগে বলা হয়েছে যে :

১. জ্বিহাদ্ সাধারণভাবে ফারজে ক্বিফায়া। অর্থাৎ মুসলমানদের পক্ষ থেকে কিছু সংখ্যক যুদ্ধে অংশ নিলে 'জানাজা নামাজ' আদায়ের মতো সবার এই ফরজ আদায় হয়ে যায়।

২. জ্বিহাদ জরুরী অবস্থায় যেমন সামগ্রিকভাবে যদি মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্র আক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন এই আপৎকালীন সময়ে সবার জন্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ফরজে আইন হয়ে পড়ে। এবং এই অবস্থায় বাবা বা ছেলে, স্বামী বা স্ত্রী যেই হোকনা কেন পারিবারিক অনুমতির অপেক্ষা না করে তার জ্বিহাদে অংশ গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এ প্রসংগে এটাও লক্ষণীয় : ইসলাম তথাকথিত ধর্ম নয়। এটি একটি 'আদর্শ'। গোটা মানবজাতির সামগ্রিক জীবনের আদর্শ। এই আদর্শের কর্মকাণ্ড ও প্রতিফলন শুধু ধর্ম-কর্মে সীমিত নয় বিধায় এটি শৌর্য-বীর্যে শক্তিপুষ্ট সামগ্রিক কল্যাণকর শক্তির বাস্তব অস্তিত্ব ও বটে।

মোটামুটি "ইসলাম" ও এর "জ্বিহাদ" সম্পর্কে পটভূমি হিসাবে উক্ত প্রাথমিক ধারণা অর্জনের পর এবার মূল আলোচনয়া প্রবেশ করলে প্রবন্ধের সম্যক উপলব্ধি বহুলাংশে সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

খ. ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বের দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য

ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি আল্লাহ পাকের বিশ্বসৃষ্টির ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিরচিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। পবিত্র কুরআনের আলোকে আমাদের এই সৃষ্টজগত দুটো বিশ্বের সমন্বয়ে গঠিত :

১. আল্ আলম আল্ আমার বা স্বাধীন বিশ্ব :

The World of Freedom

www.pathagar.com

২. আল্ আলম আল্ আখলাক বা আচরণবিধিবদ্ধ বিশ্ব :
The World of Determinism.

মানুষ স্বাধীন বিশ্বের অধিবাসী। আচরণবিধিবদ্ধ বিশ্বের অধিবাসী মানুষসহ বাদবাকী সৃষ্টিনিচয়। অর্থাৎ মানুষের মাঝে দুটো বিশ্বেরই প্রকৃতি ও স্বভাব রয়েছে। বাদবাকীসৃষ্টি শুধু আল আলম আল আখালাকের অধীনস্থ্। এসব সৃষ্টি প্রকৃতিগতভাবে স্বভাব ও আচরণে বিধিবদ্ধ। বিধি বা নিয়ম কানুনের ব্যত্যয় ঘটানোর ক্ষমতা এদের নেই; প্রবণতা বা ইচ্ছাশক্তিও নেই। সুতরাং এদের পাপ-পূণ্য করার জ্ঞান ও চরিত্র নেই। চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ্-তারা'র উদয়াস্ত ও পরিভ্রমণ, নদ-নদীর প্রবাহ, বায়ুর চলাচল, মেঘ-বৃষ্টি-রোদের আবির্ভাব-তিরোধান, পশু-পাখির জীবন-মৃত্যু ইত্যাদি তাবৎ সৃষ্টিকুল জগতস্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও স্বভাবের অধীন।

বিপরীতে মানুষের জন্ম-মৃত্যু অনুরূপ নিয়মের অধীনস্থ্ হওয়া সত্ত্বেও সে জীবনপ্রণালী ও কর্ম-কাণ্ডে আপন ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞান প্রয়োগে ভালোমন্দ করার স্বাধীনতা ভোগ করে। স্বাধীনতার এই সুযোগ নিয়ে সে নৈতিক উন্নয়ন সাধনে ফিরিশতার মতো উন্নত ও মহীয়ান হতে পারে; আবার এর অপব্যবহারে সে ইবলিসের চেয়েও নিকৃষ্ট হতে পারে বৈকি!

অন্যকথায় : মানুষ তার স্রষ্টার নির্দেশিত সৎপথে নিজেকে পরিচালিত করে ব্যক্তিজীবন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে শান্তি ও প্রগতি প্রতিষ্ঠায় পারঙ্গম হতে পারে, অথবা এর বিপরীতে জীবনযাপনে ব্যক্তি থেকে সামষ্টিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের জন্ম ও প্রসার ঘটাতে পারে।

যুদ্ধের মৌলিক কারণ :

ইসলামের দৃষ্টিতে গোটা বিশ্বে যুদ্ধ ও সংঘর্ষের মূল কারণ দুটি :

১. হক বা ন্যায় এবং

২. বাতিল বা মিথ্যা অন্যায়

এদুটির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সমাপ্তি কখনো ঘটছে না। গোটা বিশ্বের শান্তি ও যুদ্ধ সম্পর্কিত ইসলামের এই তত্ত্বকে ভিত্তি করে ইসলামের ইতিহাস - দর্শন বিরচিত ও বিকশিত।

স্বাধীন-ইচ্ছার জগতে নৈতিকতার সংগ্রামই ইসলামের ইতিহাস। এই ইতিহাসের কোন ধারাবাহিকতা বা বৃত্তাকার রূপ নেই। বরং এটি আঁকাবাঁকা (Zigzag) গতিপথে প্রবাহমান। নৈতিকতার এই যুদ্ধে হক ও বাতিলের শুধু

www.pathagar.com

পর্যায়ক্রমিক অস্থায়ী বিজয়ই পরিদৃষ্ট হয় না; বরং বিশেষ কোন নির্দিষ্ট পর্ব বা ঘটনার পটভূমিতে বাতিলের উপর হকের দীর্ঘস্থায়ী বিজয়ও পরিলক্ষিত হয়। এমন ধরনের হকের পূর্ণ বিজয় রাসূলে পাক (দ.) এর সময়ে হয়েছিলো। যেমন "মক্কা বিজয়"। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, ১৪শত বছর পূর্বের মক্কা বিজয়ের মতো বিশ্বের ধ্বংস বা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এহেন দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হবে এবং এই লক্ষ্য ও গতিধারায় ইতিহাস এগিয়ে চলছে অদ্যাবধি।

এই প্রসংগে "যুদ্ধ" সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা অর্জনের নিমিত্তে কিছু তাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি। পূর্বেই বলা হয়েছে যুদ্ধ হচ্ছে হক ও বাতিলের সাংঘর্ষিক পরিণাম ও পরিণতি। এই দুটোর মনস্তাত্ত্বিক অভিলাষ ও এর বাস্তব মোকাবেলা (the level of motive and actual confrontation) হতেই যুদ্ধের আবির্ভাব ও বিস্তার ঘটে। ন্যায় অন্যায়ের পারস্পরিক সংঘর্ষ এবং একের উপর অন্যটির প্রাধান্য বিস্তারে নৈতিক সংর্ঘই হচ্ছে "যুদ্ধ"। এ দুটি উপাদান বিশ্বপ্রকৃতির মৌলিক উপাদান যা হযরত আদম (আ.) ও ইবলিস এর জন্ম-বৃত্তান্ত থেকে উৎসারিত। World of Determinism বা বিধিবদ্ধবিশ্ব প্রশান্ত ও সুশৃংখলাবদ্ধ। মানুষের মাঝে-ও এর ফিতরাত বা স্বভাব বিদ্যমান আছে বলে মানুষ প্রকৃতির কোলে শান্তি ও সুখে বসবাস করতে চায়। কারণ সে বিধিবদ্ধ বিশ্বেরও আওতাভুক্ত। পাশাপাশি World of Freedom বা স্বাধীন বিশ্বের স্বভাব তার মধ্যে বিদ্যমান থাকায় সে প্রবৃত্তি ও প্ররোচনার প্রবণতায় উক্ত বিধিবদ্ধ বিশ্বের শৃংখলা ভংগ করে উচ্ছৃংখল জীবনের স্বাদ গ্রহণে প্রায়শ বেপরোয়া হয়ে ওঠে। মানব অধ্যুষিত বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে ইসলামের ব্যাখ্যা এটি-ই।

এই আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে,(প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ এবং শান্তির চিন্তা ও স্বভাব মানবহৃদয়ে স্রষ্টা থেকেই প্রদত্ত বা সৃষ্ট। সুপ্ত এচিন্তা ও অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে মানব রচিত পরিবেশ ও প্রতিবেশের ধরন ও প্রকৃতির প্রেক্ষপটে। এটি গণমানুষের জীবনযাপনের ধারায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অর্থাৎ :

Endemic to man's sojourn on earth.)

সৃষ্টির ঊষালগ্নেই ফেরেশতারা এটি অবলোকন করেছিলো এবং আল্লাহপাক নিজেও এর স্বীকৃত দিয়েছিলেন কুদরতী বা কাব্যিক বচনে আদম (আ.) ও ইবলিসকে মর্তে নির্বাসিত করার বর্ণনায়। গন্ধমফল নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও শয়তানের প্ররোচনায় বিবি হাওয়া ও তাঁর মাধ্যমে হযরত আদমের (আ.)

www.pathagar.com

গন্ধমফল ভক্ষণ- এই ঘটনা যুগপৎ কাব্যিক শ্রীমণ্ডিত এবং দ্বন্দ্ব বা ক্লেশ-সংঘর্ষের একটি আবশ্যিক যুদ্ধ-অস্তিত্বের আদি উপাদানও।

ইসলামের অন্যতম মৌলিক নির্দেশ হচ্ছে :

'ন্যায় বা সৎকাজের আদেশ করো ও অন্যায় বা অশ্লীল কাজ নিষিদ্ধ করো।' এই আদেশ এবং নিষেধই হচ্ছে নিরন্তর সংগ্রামী জীবনের আদর্শ নিষ্ঠা হওয়ার প্রাণন্তকর প্রচেষ্টা, এবং এ দ্বারা এটাই বুঝানো হচ্ছে যে বাতিলের উপর 'হক' এর বিজয়েই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ভূখণ্ড দখল, সম্পদ কুক্ষিগতকরণ বা ক্ষমতার অধিকার ও দাপট বুঝায় না। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিতে "ইসলামে যুদ্ধ বলতে ভূখণ্ড দখল বুঝায় না। ইসলাম হচ্ছে যুদ্ধমুক্ত দুনিয়া যা প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে কাজকর্মে নিয়োজিত থাকা। এই প্রত্যয় বিধৃত ইসলামী আদর্শ সংঘর্ষ, আক্রমণ ও যুদ্ধসজ্জাকে প্রদমিত রাখার প্রয়াসী"। এই প্রসংগে ঐতিহাসিক টয়েনবির মন্তব্যটি লক্ষণীয়। তাঁর মতে যুদ্ধ প্রত্যেক সভ্যতার ধ্বংসের প্রত্যক্ষ কারণ এবং এটাও সুনিশ্চিত যে প্রত্যেক সভ্যতার ধ্বংসলীলা। ইবনে খালদুনের দৃষ্টিভংগীটিও প্রসংগক্রমে বিচার্য। তাঁর বিশ্লেষণে "প্রকৃতপক্ষে এটি যুদ্ধ নয় বরং বাতিলের বিজয় যার পরিণামে একটি সভ্যতার নৈতিক ও নীতিশাস্ত্রীয় মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়ে।" সভ্যতার ধ্বংসের মৌলিক কারণ এটিই। এ'দুই মনীষীর ঋজু বক্তব্য এটিই যা ইসলাম যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদেরকে প্রত্যয়শীল করতে চায়। অন্যকথায় বাতিলের প্রদমন ও উচ্ছেদ সাধনই শান্তি ও সমৃদ্ধি যা' মানবসভ্যতার নিশ্চিত উন্মেষ প্রতিষ্ঠা করে এবং বাতিলের উচ্ছেদ ও প্রতিরোধের জন্যই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাই "যুদ্ধের" নিয়ন্ত্রণ ইসলামের একটি মৌলিক নির্দেশ।'

গ. ইসলামের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক শৃংখলা : দার আল্ ইসলাম ও দার আল্ হারব প্রসংগে ইমাম আবু হানিফা

উল্লেখ্য, ইসলামের মৌলিক দর্শন অনুযায়ী গোটা বিশ্বের শৃংখলা আবশ্যিকভাবে এর নৈতিক শৃংখলা বিযুক্তির উপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক মৌলিক শৃংখলার Unit বা একক হচ্ছে "Community State" বা একক সম্প্রদায়ভিত্তিক রাষ্ট্র। এই সম্প্রদায় আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী ও তাঁর নির্দেশ পালনকারী। এরা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মানুষ যখন স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে

www.pathagar.com

নিজেকে এমনিভাবে আল্লাহপাকের নিকট সোপর্দ করে, তখনই সে এবিশ্বে শান্তির পরিবেশে বসবাস করার যোগ্যতা অর্জন করে, শান্তিময় ও প্রগতিশীল জীবনযাপনের সৌভাগ্য লাভ করে। এভাবে আত্মসমর্পণটাকে কুরআনের পরিভাষায় ইসলাম বলে। এর বিপরীতে যে জীবন সেটাই ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও গোটা বিশ্বে অশান্তি ও বিপর্যয়, ধ্বংস ও হত্যা এবং হত্যাজনিত পরিবেশের জন্ম দেয়। এটি কালক্রমে যুদ্ধের আবির্ভাব ও প্রসার ঘটায় মানবসমাজের মাঝে। পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় এটি কুফর, যা শয়তানের চরিত্র ও প্রকৃতির প্রকাশ। আর কুফর ন্যায় ও সত্য, হক ও পুণ্যের পরম শত্রু।

প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলাম যদি Community State বা সম্প্রদায় ভিত্তিক রাষ্ট্রের মাধ্যমে বিশ্বশান্তির বিধান দেয়, অথবা ধর্মের (সার্বিক অর্থে) ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠনের মাধ্যমে বিশ্বশান্তির নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য রাষ্ট্র বা অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত রাজ্যের অবস্থানটা কোথায়? এর জবাবে ইসলামের বিধান হচ্ছে এই যে : ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপ্রিয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপিত হবে "Treaties of Friendship and Non-aggression"-বন্ধুত্ব ও অনাক্রমণ চুক্তির ভিত্তিতে। এর অন্তর্নিহিত কথাটি হচ্ছে "Pax Islamica- a world-order built on peace, a peace built upon reason, reason whose guarantor is Allah Himself". ইসলামিক বিধান অনুযায়ী শান্তির ভিত্তি হচ্ছে একটি বিশ্ব শৃংখলা, যার নিশ্চয়তা প্রদানকারী স্বয়ং আল্লাহপাক। যথার্থ অর্থে এ ধরনের বিরচিত বিশ্বকেই "দার আল্ সালাম" বা "শান্তির বিশ্ব" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর কথায় এটিই "দার আল্ ইসলাম"। এধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে এর শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ প্রকৃতিগত ও আবশ্যিকভাবে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বসবাস করবে। এটাই স্বাভাবিক সত্য, এটাই প্রকৃতিজাত। এর মূলকারণ : ইসলামই একমাত্র বিধান যা' গোটা মানবজাতিকে একটি মাত্র পরিবার হিসাবে মানতে বাধ্য করেছে এর অনুসারীদেরকে। ফলশ্রুতিতে ইসলামের বিধানে প্রত্যেকটি মানুষই জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে আপন বৈশিষ্ট্যসহ সমমান-মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার অধিকারপ্রাপ্ত। ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হোক, কিংবা অন্য কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসী হোক, ইসলামী রাষ্ট্র বা সরকারের নিকট যে কোন মানুষ এমনিভাবে মানবিক মর্যাদা লাভ করে বিধায় পড়শী অমুসলিম রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

জনগণ শান্তি ও স্বস্তি, নিরাপত্তা ও হৃদ্যতা উপভোগ করে। এরা ইসলামী রাষ্ট্রকে পড়শী রাষ্ট্র হিসাবে পেয়ে অবশ্যি সৌভাগ্যবানও মনে করে।

আবার বিপরীতে যদি কোন অমুসলিম রাষ্ট্র আক্রমণাত্মক হয় ও আক্রমণের পাঁয়তারা করে তবে এই রাষ্ট্র ইসলামের দৃষ্টিতে "দার আল্ হরব" বা যুদ্ধবাজ রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত হবে। শুধু তা-ই-নয়; বরং যেসব রাষ্ট্রের নাগরিক মানবিক মর্যাদা ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত, সেসব রাষ্ট্রও "দার আল্ হরব" বা যুদ্ধবাজ রাষ্ট্র হিসাবে সনাক্ত হবে। লক্ষণীয় : শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রের দায়িত্ব একদিকে যেরূপ নিজস্ব নাগরিক ও পড়শীরাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও মানবিক অধিকার-এর হেফাজত ও সংরক্ষণ করা, অপরদিকে পড়শীরাষ্ট্রের নাগরিকদেরও অনুরূপ অধিকার সংরক্ষিত হচ্ছে কি-না তাও পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে এক্ষেত্রে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাও এই রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্বও বটে। আবার এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, যেই মাত্র এধরনের অ-ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের ধন-সম্পদ-জীবন ও মানবিক মর্যাদা পুনর্বহাল হয়ে যাবে, সেই মুহূর্ত থেকেই সেই রাষ্ট্রটিকে "দার আল্ হরব" হিসাবে আর বিবেচনা করা যাবে না। ইমাম আবু হানিফা (র.) এমনিভাবে "দার আল হরব" এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ঘ. কতিপয় মনীষীর দৃষ্টিতে দার আল্ ইসলাম ও দার্ আল্ হরব

এই প্রসংগে কাতিপয় প্রাচ্য রাজনীতিবিদের 'দার আল্ ইসলাম' ও 'দার আল্ হরব' সম্পর্কে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারক বক্তব্যসমূহ বিচার্য। উদাহরণ স্বরূপ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনপণ্ডিত ডঃ হান্স ক্রুজের মন্তব্যটি।

তিনি বলেন-The rules and provisions of Muslim law..... were built up to the principle of perpetual energy with and of coercive advance against the unbelievers... . The starting point.... is the principle of the separation of the world of Islam from non Muslim environment as well as the principle of religious enmity between the two, which has found expression in the central idea of Jehad, the Holy war .... . অর্থাৎ মুসলিম আইন কানুন অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জবরদস্তীমূলক স্থায়ী শত্রুতার নীতির উপর নির্মিত। .... এর শুরুটি হচ্ছে ইসলামী বিশ্বকে অমুসলিম বলয় থেকে আলাদা করার নীতি

www.pathagar.com

দিয়ে, তৎসঙ্গে এই দুয়ের মধ্যে ধর্মীয় শত্রুতার নীতি, যা জিহাদ, পবিত্র ধর্মযুদ্ধের মর্মকথা হিসাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। ...মি: ক্রুজ অন্যত্র ব্যক্ত করেন- The relation of the Muslims with their unbelieving environment are totally dominated.... by this idea of the Holy war.... According to it, Jehad means the perpetual warfare between the Islamic Community or Commonwealth and the non Muslims. "অবিশ্বাসীদের পরিবেশের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কে ধর্মযুদ্ধের ধারণাটি প্রবল। এটি অনুযায়ী জিহাদ হচ্ছে ইসলামী সমাজ বা কমনওয়েলথ এবং অমুসলিম সম্প্রদায় এই দুটোর মাঝে একটি স্থায়ী যুদ্ধাবস্থা। অনুরূপ মন্তব্য আব্দুল মজিদ খাদ্দুরী নামক জনৈক প্রথিতযশা মুসলিম অধ্যাপকও করেছেন তাঁর "Islam in the West" গ্রন্থে। তিনি Pax Islamica এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন যে, মুসলিম আইনের কারণে গোটাবিশ্ব দুটো ভাগে চূড়ান্তভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একটি দারুল ইসলাম ও অপরটি দারুল হারব্। তিনি দারুল ইসলামের বহির্ভূত সব রাষ্ট্রকে 'দারুল হারব্' হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করেছেন এবং তাত্ত্বিকভাবে জিহাদকে ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী হাতিয়ার হিসাবে অমুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ব্যবহারের একটি বিধানের মতো প্রতিভাত করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। মুহাম্মদ তালাত বিন হাস্সান নামক অপর এক মুসলমান পণ্ডিতও "The Muslim cocept of International Law and the Western Approach" গ্রন্থে এ ধরনেরই ভুল ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করেছেন। এসব পণ্ডিত ইমাম আবু হানিফা (র) এর ব্যাখ্যা হয় অধ্যয়ন করেননি, অথবা মুসলিম বিদ্বেষী অমুসলিম লেখকদের গ্রন্থরাজির প্রভাবে বিপথগামী হয়ে ইসলামের যুদ্ধ সম্পর্কিত স্বচ্ছ পবিত্র নীতিমালা অনুবধাবনে অপারগ হয়ে দুর্ভাগাদের দলভুক্ত হয়ে পড়েছেন। ঠিক এমনিভাবে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের অপব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামের "যুদ্ধ" সম্পর্কিত আদর্শিক ও স্বচ্ছ ধারণাকে বিকৃত-বিদ্বেষপ্রসূত করার অপচেষ্টা চালাতে দেখা যায় অনেককে। সংশ্লিষ্ট আয়াতটির বাংলা তর্জমা হচ্ছে : "যুদ্ধ করো তাদের সাথে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল যাহা হারাম করেছেন তাকে হারাম হিসাবে গণ্য করেন। এবং সঠিক দ্বীনকে দ্বীন হিসাবে অনুসরণ করে না।" (সুরা: আয়াত :)

www.pathagar.com

এখানে লক্ষ্যনীয়, দার আল্ হরব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইমাম রহমতুল্লাহ্ আলাইহে তাঁর 'সীয়ারুল কাবীর' গ্রন্থে যা বলেছেন এর সারাংশ নিম্নরূপ :

১. রাষ্ট্র প্রধান যদি অমুসলিম হন, ২. রাষ্ট্র প্রধান মুসলমান অথচ তিনি অমুসলিমদের প্রভাব বা নির্দেশে যদি দেশ পরিচালনা করেন (দৃষ্টান্ত : বর্তমান পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরাক) ৩. রাষ্ট্র প্রধান মুসলমান অথচ রাষ্ট্র অমুসলিমের— এ তিনটির প্রত্যেক রাষ্ট্রই দার আল্ হরব্ হিসাবে পরিগণিত হবে। [সুধী পাঠকের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পবিত্র কোরআনের সুরা আনফাল ও সুরা তাওবা-য় ইসলামে যুদ্ধনীতির আরো বিশদ আলোচনা ও নির্দেশ রয়েছে।—গ্রন্থকার]

৬. ইসলামে যুদ্ধ কঠিন ইবাদত

প্রকৃতপক্ষে উক্ত আয়াতটি প্রকৃতিপূজারী কুরাইশদের সম্পর্কে নাযিলকৃত, ঐ সব কুরাইশ যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পূর্ব হতেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো। আর এমন ধরনের যুদ্ধ যেসব সম্প্রদায় ঘোষণা করবে কেবল তাদের বিরুদ্ধেই এই আয়াতের নির্দেশ পালন মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে যায়। যা হোক, **ইসলামে জ্বিহাদ হচ্ছে একটি নৈতিক বিধান বা Moral code. সুতরাং এটি একটি মারণাস্ত্র নয়।** ফলে এটি ভীতি সৃষ্টি বা আক্রমণের জন্যেও প্রয়োগ করা যাবে না। আবার এর প্রয়োগে মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার নেই, বরং যে কোন হামলা বা আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে এহেন আক্রমণ বা যুদ্ধ পরিচালনা করা যাবে। মিথ্যা, অন্যায়ের ছোবল ও রাহুগ্রাস থেকে সত্য ও মানিবক গুণাবলীর মূল্যবোধ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ইসলামে যুদ্ধ একটি ধর্মীয় নির্দেশ ও কর্তব্য। এই নির্দেশ পালনের সময় যুদ্ধময়দানে নিহত হলে 'শহীদ' ও বিজয়ী হলে 'গাজী' উপাধিতে ভূষিত করে ইসলামে জ্বিহাদ বা যুদ্ধকে সুকঠিন ইবাদাতের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। শহীদদেরকে মৃত নয় বরং জীবিত বলে পাক কুরআনে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

এই আলোচনা থেকে এটা স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিস্ফুট, ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ বলতে কখনো কোন জাতি বা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিছক সংগ্রাম বুঝায় না। ধর্মান্তরিত করার জন্যেও এই যুদ্ধ পরিচালনা করা বুঝায় না। এইক্ষেত্রে পাক কালামে অত্যন্ত কঠোর হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে। সুরা 'কাফেরুন'

www.pathagar.com

এর একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত : 'লাকুম দ্বিনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন' অথবা পবিত্র কোরআনের অপর এক আয়াত "লা ইকরাহ্ ফিদ্বীন" (সুরা বাকারা-২৫৬) : যার যার ধর্ম তার তার কাছে, ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তী নেই। ইসলামের স্বভাব হচ্ছে যুদ্ধ পরিহারকরণ। সশস্ত্র যুদ্ধের উস্কানী বন্ধ করার ক্ষেত্রে যখন সর্বপ্রকার শান্তিপূর্ণ আলোচনা ব্যর্থ হয়, তখনই কেবল ইসলাম অস্ত্র ধারণের নির্দেশ দেয়। কাফিরদের ওয়াদা ভঙ্গের স্বভাব ও চরিত্রের প্রেক্ষিতে মুমিনদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের ঘোষণাটি এখানে স্মর্তব্য। "তাদের চুক্তির পর তাহারা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করে ও তোমাদের দীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে তবে কাফির-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর; এরা এমন লোক যাদের কোন প্রতিশ্রুতি র'ল না; যেন তারা নিবৃত্ত হয়।

তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে ও রাসূলের বহিস্করণের জন্য সংকল্প করেছে? এরাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? আল্লাহ্কে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে অধিক সমীচীন যদি তোমরা মোমেন হও।

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হস্তে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন। তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন ও মুমিনদের চিত্ত প্রশান্তি করবেন।

এবং তিনি এদের (মুমিনদের) অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (তাওবা : ১২–১৫) এই প্রসংগে রাসূলে খোদার (সঃ) সংশ্লিষ্ট নির্দেশটিও লক্ষ্যণীয় :

"যুদ্ধের ময়দানে শত্রু মোকাবেলার জন্য ব্যগ্র হয়ো না"।

রাসূলে পাকের (সঃ) নির্যাতিত মক্কী জীবনের ১৩টি বছর এর একটি অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই দীর্ঘ সময়টিতে নির্মম অত্যাচার-উৎপীড়নে নিরপরাধ মুষ্টিমেয় মুসলমানদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানগণ যুদ্ধংদেহী মনোভাবটি পর্যন্ত ব্যক্ত করেননি, বরং কাফেরদের এহেন নির্মম নিষ্পেষণে অতিষ্ঠ হয়ে পরিবার-পরিজন, বাড়ীঘর, সহায়-সম্পত্তি ও দেশ বিভূঁইয়ের মায়া ছিন্ন করে এঁরা মদীনায় হিজরত করেছিলেন। এই হিজরতও হয়েছিলো আল্লাহর নির্দেশ প্রাপ্তিতে। সেখানে পৌঁছার পর কাফের, মুশরেক ও মুনাফেকদের হিংস্রথাবা যখন মদীনা পর্যন্ত প্রসারিত হল, তখনও মুসলমানরা আল্লাহর তরফ থেকে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আক্রমণকারী কাফের মুশরেকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র

www.pathagar.com

ধারণ করেননি। সূরা হজ্জে আল্লাহ ঘোষণা করেন- "যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হচ্ছে তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) অনুমতি দেয়া হল (যুদ্ধের), কারণ তারা মযলূম। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করার মতো শক্তিশালী। তারা সেই মতো শক্তিশালী। তারা সেইসব লোক যাদেরকে শুধু "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ এই কথাটুকু বলার কারণে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ঘরবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ যদি একদল মানুষকে আরেক দল দিয়ে দমন করার ব্যবস্থা না রাখতেন তাহলে মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, এবাদতখানাসমূহ, যেখানে আল্লাহর নাম উচ্চারণ বেশি করা হয়ে থাকে, সবই ধ্বংস করে দেয়া হতো। আল্লাহকে যে সাহায্য করবে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ মহাশক্তিশালী, মহাপ্রতাপশালী। তারা সেই সব লোক যাদের আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা ও সুযোগ দিলেই নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবে এবং অন্যায় ও অসত্যকে প্রতিরোধ করবে। আল্লাহর হাতেই সবকিছুর চূড়ান্ত পরিণতি।" (হজ্জ : ৩৯-৪১)

মদীনা শরীফে মুসলমানদের জীবন যখন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে তখনই আল্লাহপাক তাদেরকে রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে আত্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুমতি দান করেন। বদর-ওহুদ-খন্দকসহ সর্বমোট ৮৮টি অভিযান (২৮টি গাযওয়া : নবীজীর নেতৃত্বে যুদ্ধ, এবং ৬০টি সরিয়্যা : শত্রুর বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ) তথা যুদ্ধ কাফের-মুশরেকদের সাথে মুসলমানদের সংঘটিত হয়। এই আলোচনা থেকে এটা সহজেই হৃদয়ংগম করা যায়, ইসলামের আবির্ভাবই হয়েছে যুদ্ধ পরিহারে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্যে।

উল্লেখ্য, পবিত্র মদীনা মনোয়ারায় পৌঁছেই আল্লাহর রাসূল (স.) ইহুদী ও মোশরেকদের সাথে মুসলমানদের সুসম্পর্ক ও শান্তি বিধানের জন্যে যে ঐতিহাসিক সনদ প্রণয়ন করেন সেই সনদ-ও "যুদ্ধ নয় শান্তি" এর এক অনুপম নিদর্শন। তিনি মদীনা শরীফের নিরপত্তা বিধানের জন্য ইহুদী, খৃষ্টান ও বেদুঈনদের সাথে সন্ধি-চুক্তি করে তাদেরকে নিয়ে একটি সমন্বিত জাতিরূপে ঘোষণা দেন।

অন্যকথায় : ইসলাম বিধাতার অমোঘ "জীবন বিধান" হিসাবে প্রেরিত হয়েছে বিশ্বমানবের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য। এই দৃষ্টিতে খোদাদ্রোহী বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে ইসলাম নিম্ন ৩টি শর্তের যেকোন ১টি শর্ত গ্রহণের আহ্বান জানায় :

www.pathagar.com

১. ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের ভাই হয়ে যাও।

২. নইলে জিজিয়া কর দিয়ে মুসলমানদের মত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ কর।

[ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদেরকে নিরাপত্তার ও যুদ্ধের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের বিনিময়ে যে কর দিতে হয় তা-ই জিজিয়া।]

৩. অন্যথায় যুদ্ধের মাধ্যমে ফয়সালায় উপনীত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নাও।

লক্ষনীয় : আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর (রা)-এর শাসনকালে মুসলিম সেনাবাহিনীকে উক্ত ৩টি নির্দেশের ভিত্তিতে অমুসলিম রাষ্ট্রে প্রেরণ করা হতো।

উক্ত ৩টি নির্দেশ কার্যকরী করার জন্যে পবিত্র কোরআনে আদেশ করা হয়েছে এই বলে : "তোমরা এমন শক্তি অর্জন কর যা দ্বারা কাফেররা সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়ে।" (আনফাল : ৬০)

বোখারীর শরীফের সংশ্লিষ্ট হাদিসে উক্ত শক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, নিক্ষেপ করার মধ্যেই শক্তি নিহিত। এই নিক্ষেপ বলতে তফসীরকারগণ 'মিসাইল' নিক্ষেপ করার সামর্থ্য হিসেবে শক্তি অর্জনের কথা বুঝিয়েছেন। মোট কথা হল, ইসলাম বিজয়ী হিসাবে পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত থাকবে। বিজিত নয়, এইটিই এই শক্তির কল্যাণকর প্রকৃতি।

চ. ইসলামে যুদ্ধবন্দীদের মর্যাদা

এ প্রসংগে এটিও অনুধাবনযোগ্য যে আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থান ভেদে ইসলামে যুদ্ধবন্দীদের জন্য মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তঃ বদরের যুদ্ধে ৭০ জন যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে কিছু ছিলেন "শিক্ষক যুদ্ধবন্দি"। সুনির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রকে পাঠদানের বিনিময়ে তাদের মুক্তিপণ আদায় করা হয়। এই বন্দীদের মধ্যে 'সুহাইর বিন আমর' নামক জনৈক বন্দী সুবক্তা ছিল। সে রাসূলে পাক (স.) এর নামে অত্যন্ত কুৎসিত বক্তব্য দিয়ে কাফের সম্প্রদায়কে ক্ষিপ্ত করে তুলতো ভীষণভাবে। হযরত ওমর (রা) তার ব্যাপারে এই প্রস্তাব করেন যে, সুহাইর বিন আমর এর সামনের পাটির দুটি দাঁত উপড়ে ফেলা হোক, যাতে বোঝা যায় তার অপকর্মের জন্য এমনটি শাস্তি দেয়া হয়েছে। রাসূলে পাক (স.) এতে সম্মতি দেননি। বরং তিনি বললেন, শেষ বিচারের দিনে আল্লাহও তো তাকে এরকম করে দিতে পারেন। রাসূলে পাক (স.) এর এহেন উদারতা ও মায়ামমতায় সুহাইর বিন আমরের মতো পাষণ্ডও বেঁচে গেল মুখমণ্ডল

www.pathagar.com

বিকৃত হওয়ার নায্যশাস্তি প্রাপ্তি থেকে। ঠিক এমনি আর একটি ঘটনা স্মরণীয়। বদরের যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যেককে বিভিন্ন খাম্বা বা খুঁটির সাথে এমনভাবে শক্ত করে বাধা হয়েছিল যে এতে প্রত্যেক বন্দী বন্ধনের যাতনায় রাত্রিতে গোংগাচ্ছিল তীব্র কণ্ঠে। এদের মধ্যে রাসূলে পাক (স.) এর চাচা আব্বাস বিন মোতালেবও ছিলেন। হযরত (স.) গোংগানী শব্দে অস্থির হয়ে পড়েন ভীষণভাবে। সাহাবীরা রাসূলের (স.) এই মানসিক অস্থিরতা অবলোকন করে আব্বাসের (যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) বাঁধন শিথিল করে দেয়ার জন্য অনুমতি যাচনা করেন। প্রত্যুত্তরে আল্লাহর রাসূল (স.) সবারই বন্ধন শিথিল করার নির্দেশ দেন এই বলে, "শুধু আমার চাচার নয়, সবারই বন্ধন শিথিল করে দাও।" উক্ত কতিপয় উদাহরণ থেকে এটি দিবসের ন্যায় দেদীপ্যমান যে ইসলামে যুদ্ধবন্দিরাও কত সৌভাগ্যমণ্ডিত।

প্রসংগত এটাও স্মর্তব্য যে : বদরের যুদ্ধে রাসূলের (স.) সাহাবীগণ বন্দিদেরকে উটের পিঠে তুলে নিজেরা পায়ে হেঁটে মদীনায় গিয়েছিলেন; নিজেরা শুষ্ক খেজুর খেয়েছেন, বন্দীদেরকে আপ্যায়ন করেছেন রুটি পরিবেশনের মাধ্যমে। এহেন মানবতা বিধৃত ইসলামের যুদ্ধনীতির ফলে দেখা যায় রাসূল (স.) এর ৮ বছর ব্যাপী যুদ্ধ পরিচালনায় বড়জোর ৭/৮ শত কাফের নিহত হয়েছিলো, এবং একটি মাত্র যুদ্ধে বন্দী হাওয়াজিন গোত্রের ৬ হাজারের বেশি বন্দীকে মুক্তি দান করেছিলেন। তাছাড়া মক্কা বিজয়ের দিন হযরত (স.) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণায় সবাইকেই অবারিত মুক্তিদান করেছিলেন।" [সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, জ্বিহাদ পৃ. ৪৩৮-৪৪৩ দ্রষ্টব্য]

স্যার উইলিয়াম ম্যুর যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলামের এই অনুপম মানবতার পরিচয় পেয়ে এই সত্যটি ব্যক্ত করতে বাধ্য হন যে :

In pursuance of Mohammad's command, the citizens (and Muhajeers) received the prisoners with kindness and consideration. "Blessing on the men of Medina", said one of those in later days, "they made us ride, while they themselves walked afoot, they gave us wheaten bread to eat when there was little of it contending themselves with dates."

"মুহাম্মদের (স.) আদেশ অনুসরণে নাগরিকরা (মোহাজেরবৃন্দ) বন্দীদেরকে মায়ামমতা ও নম্রতার সাথে বরণ করে নিলেন। 'মদীনাবাসীদের ওপর আশীর্বাদ

www.pathagar.com

বর্ষিত হোক', পরবর্তীতে ওদের একজন বলে ছিলেন, "তারা আমাদেরকে উটে চড়িয়ে নিলেন, অথচ নিজেরা গেলেন পদব্রজে, তারা আমাদেরকে খাওয়ার জন্য গমের রুটি দিলেন। অথচ নিজেরা সামান্য ক'টি খেজুর খেয়ে পরিতৃপ্ত রইলেন।"

মূল কথা হচ্ছে : ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছে অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও সংযতভাবে। মুসলমানদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, যে পরিমাণ আক্রমণ করা হয়, ঠিক সেই পরিমাণ পাল্টা শাস্তি বা আক্রমণ করা যাবে। এর মূখ্যউদ্দেশ্য হচ্ছে আক্রমণকারীকে প্রতিহত ও নিবৃত্ত করা। কিন্ত এতেও যদি ফল না হয় তাহলে আক্রমণকারীর অনিষ্ট ও রক্তপাত থেকে প্রাণ-মান-সম্পদ রক্ষার লক্ষ্যে আক্রমণকারীকে উৎখাত করা তখন স্বাভাবিকভাবে অত্যাবশ্যক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। তদুপরি হতভাগ্য কাফেরদের প্রতি ইসলামের যে মানবতা ও দরদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা দৃষ্টে একমাত্র ইবলিস ও এর দোসররা ব্যতীত যে কেহ এই সত্যটুকুর স্বীকৃতি দিতে বাধ্য যে ইসলামে যুদ্ধ অর্থই হচ্ছে স্বর্গীয় আশীর্বাদ শুধু মানুষ নয় গোটা দৃষ্টিকুলের জন্যে একটি পরম ব্যবস্থা পত্র। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে এর ইতিহাস-সিদ্ধ যে বর্ণনা রয়েছে পাঠককুল এই সত্যটুকু যথার্থ হৃদয়ঙ্গমে অবশ্যই সফল হবেন ইনশাল্লাহ্।

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মানবতা ও পরিবেশ রক্ষায় ইসলামের যুদ্ধ

ক. মানবিক আচরণ প্রসংগ

যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মানবিক আচরণ সংরক্ষণ করার জন্যে ইসলাম মৌলিক দুটো সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে :

১. শত্রুপক্ষের যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। এরা হচ্ছে নারী, শিশু ও বৃদ্ধ।

২. ফলবান বৃক্ষ ও খাদ্যশস্য ধ্বংস করা যাবে না। কারণ এসব নিয়ামত শত্রুমিত্র সবার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত।

এজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলামের যুদ্ধনীতির মধ্যে নিম্ন নির্দেশসমূহ অবশ্য পালনীয় :

ক. নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

খ. লাশ বিকৃত করা নিষিদ্ধ।

গ. বন্দী ও দূত হত্যা নিষিদ্ধ।

যুদ্ধ বিরতি বা পরিহার করার ক্ষেত্রে ইসলাম "সামরিক চুক্তির" উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামের নির্দেশ, শত্রুপক্ষ যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করামাত্র মুসলমানগণও অস্ত্র সংবরণ করবে এই প্রত্যাশায় যে এতে যুদ্ধের অবসান হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হতে পারে। শুধু তা-ই নয়, এমনকি দুরভিসন্ধি নিয়েও যদি শত্রুপক্ষ মুসলমানদের সর্বনাশ করার জন্য সন্ধিবদ্ধ হয়, সেই অবস্থাতেও মুসলমানদেরকে ঈমানদারীরসাথে চুক্তিসমূহ পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ চুক্তি পালনের দায়িত্ব মুসলমানদের উপর শুধু একটি সামরিক নীতিই নয়, বরং এটি ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে ফরজ বা অত্যাবশ্যকও। রাসূল (দ.) কে তাই দেখা যায়- প্রত্যেক যুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্বে এই দোয়া করতে যে :

www.pathagar.com

"হে আল্লাহ আমরা আপনার দাস এবং তারাও (শত্রুরা) আপনার দাস। আমাদের লোকলস্কর ও তাদের লোকলস্কর আপনাই অধীনস্থ। হে আল্লাহ তাদেরকে পরাজয় করার ক্ষেত্রে আপনি আমাদের সহায় হউন।" তিনি মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন, "যুদ্ধ শুরু করার জন্য মুসলমানগণ কখনো প্রথম যুদ্ধময়দানে অবতরণ করবে না। শত্রু আঘাত হানলেই মুসলমানগণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।" তিনি হযরত মুয়াজ ইবনে জাবালকে (রা.) এই বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে :

"তাদেরকে আনুগত্য প্রদর্শনের অথবা শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার আহ্বান না জানিয়ে প্রথমেই তাদের সাথে যুদ্ধ করো না। এবং যদি এতে তারা অনীহা দেখায় তাহলে তারা পুনরায় উদ্যোগ না নেয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করো না। প্রতীক্ষা করো সে পর্যন্ত, যেপর্যন্ত না তারা তোমাদের একজনকে হত্যা করেছে। তারপরই তাদেরকে দেখাও এবং তাদের উদ্দেশ্যে বলো, "এর চেয়ে কি উত্তম পথ ছিলো না? যদি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের একজন তোমার দৃষ্টান্ত অনুসরণে আল্লাহ নিকট আত্মসমর্পণ করে তবে কি ইহা তোমার গোটা বিশ্বজয় অপেক্ষা অধিক ভালো হবে না?" ইসলামের যুদ্ধে মানুষ এবং মানবতার মূল্য সংরক্ষণে এর চেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয়টি আছে কি? (ইসলাম বলে, মৃতদেহ দেখে যদি শত্রুর হৃদয়ে মানসিক যন্ত্রণার উদ্রেক না হয়, এবং আক্রমণ বন্ধ করে শান্তিচুক্তি সম্পাদনে না এগুয়ে আসে, কেবল তখনই মুসলমানদের জন্য যুদ্ধ ফরজ হয়ে যায়।)

খ. রাসূল (দ.) এর যুদ্ধ-পটভূমি ও যুদ্ধনীতি

এই প্রসঙ্গে রাসূলে পাক (সা.) এর যুদ্ধজীবন ও যুদ্ধনীতির কিছুটা আলোচনা করা যাক। তাঁর আমৃত্যু সংগ্রামমুখর জীবনে বিশেষ কতিপয় দিক নিয়ে তিনি যুদ্ধ সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি কি নির্দেশ দিয়েছিলেন তা পর্যালোচনা করলেই ইসলামে যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি সম্পর্কে স্বচ্ছতর ধারণা অধিকতর পরিস্ফুট হবে নিশ্চয়ই।

মক্কীজীবন ও মদনীজীবন এই দুই অধ্যায়ে রাসূলে করিমের (দ.) ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিরচিত। নবুয়্যত প্রাপ্তির [৬১১ খ্রি.] প্রথম ১৩ বছর তিনি মক্কায় ইসলাম প্রচারকালীন অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। পাষাণ্ড কুরাইশরা তাঁর অনুচরবর্গের উপরও অমানবিক এবং

www.pathagar.com

বর্বরোচিত আক্রমণ চালিয়েছিলো। অসহ্য নির্যাতনের শিকার হয়ে কেহ কেহ ইসলাম ত্যাগ করতে পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিলেন তখন। মুসলমানদের জনশক্তির অভাব, সমরোপকরণের অতি অপ্রতুলতা এবং সাংগঠনিক দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে শক্তিশালী কাফেররা যখন নৃশংস অত্যাচার চালায়, তখন বাড়ীঘর, জোত-জমি, আপন পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে কতিপয় মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিযরত করতে বাধ্য হন। কুরাইশরা এতে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, প্রতিহিংসার আগুনে হয়ে পড়লো হিংস্র জানোয়ারের চেয়েও জঘন্য। এছাড়া আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বাইয়াত গ্রহণকারী কতিপয় মদীনাবাসী মদীনায় যখন ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে সেখানে সোনালী উষার সূচনা করলো মক্কাবাসীরা তখন আরো উম্মত্ত ও উত্তেজিত হয়ে পড়ল। এ সময়টিতে আবু জেহেলের নেতৃত্বে রাসূলে পাক (দ.) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও পাকানো হয়।

যুদ্ধের সূচনালগ্ন : হুদায়বিয়া সন্ধি - (৬ষ্ঠ হিজরী, ৬২৮ খ্রি.)

এ প্রসংগে লক্ষণীয়, নবুয়্যত প্রাপ্তির পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তদানীন্তন আরবের যে ব্যক্তিটি ছোট-বড় নারী-পুরুষ, কাফের, মুশরিক নির্বিশেষে সবার নিকট "আল আমিন" উপাধিতে ভূষিত ও সম্মানিত ছিলেন, নবুয়্যতপ্রাপ্তির পর সেই পরম শ্রদ্ধাশীল, আদরণীয় ও স্নেহাস্পদ ব্যক্তিটিকে তাঁর সংগী-সাথীসহ চরম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিলো। হযরত বিলাল, হযরত খাব্বাব, বিবি সুমাইয়া (রা.) প্রমুখের উপর কৃত অমানুষিক নির্যাতন ও লোমহর্ষক অত্যাচারের কাহিনী বিশ্বের ইতিহাসে ঈমান ও আদর্শের পথে কোরবানীর নজীরবিহীন চিরউজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। সুতরাং এটি ইতিহাসসিদ্ধ দৃষ্টান্ত যে রাসুলে পাক (দ.) এর মক্কীজীবন ছিলো নিরবচ্ছিন্ন নির্যাতনবরণ ও যুদ্ধ পরিহারের এক বিস্ময়কর অধ্যায়! সত্যিকার অর্থে ইসলামে যুদ্ধের ইতিহাস বিরচন ও ক্রমবর্ধমান যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে রাসুলে পাকের (দ.) মদীনার জীবন শুরু হওয়ার সাথে সাথে। "সোলেহ হুদায়বিয়াহ" বা হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকেই মুসলমানদেরকে ক্রমশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিলো। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে আল্লাহর রাসূল ১৪ শত সাহাবী নিয়ে ওমরাহ করার উদ্দেশে মদীন থেকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। 'জুল হুযায়ফা' নামক স্থানে পৌছে তিনি বনি খোযায়ার-এর বিসির বিন সুফিয়ান নামক এক ব্যক্তিকে গুপ্তচর হিসাবে কুরাইশদের গতিবিধি সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্যে মক্কায় পাঠান। বিসির মক্কা থেকে এসে

www.pathagar.com

রাসূল কে (দ.) এই সংবাদ দেন যে, কুরাইশরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তারা মুসলমানদেরকে বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করতে দেবে না। এই সংবাদের ভিত্তিতে রাসূল (দ.) হুদায়বিয়া প্রান্তরে পৌছে সাহাবীদের সাথে পরামর্শক্রমে হযরত ওসমান (রা.) কে দূত হিসাবে নিম্ন নির্দেশ দিয়ে মক্কায় পাঠান।

"তুমি তাদেরকে গিয়ে বলো, আমরা একমাত্র ওমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে এসেছি, যুদ্ধ করার কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি....।"

হযরত ওসমান, হযরত আব্বাস বিন সাদ্ বিন আস (রা.) এর ঘোড়ায় চড়ে মক্কায় পৌছেন। হযরত ওসমানের এভাবে প্রস্থানের পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় গুজব উঠলো, হযরত ওসমানকে (রা.) কাফেররা হত্যা করেছে। আল্লাহর রাসূল এই সংবাদ শ্রুত হওয়া মাত্রই অনুচরবর্গকে 'বায়আত' করান এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে যে, যদি যুদ্ধ বেঁধে যায় তাহলে মুসলমান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে পারবে না। প্রাণপণ তাদরকে লড়াই করতে হবে। হযরত আবু সানালু আসাদী হচ্ছেন পরম সৌভাগ্যবান যিনি প্রথম বাইয়াত নেন। এই সময়ে একটি উটের পেছনে লুকিয়ে থেকে এক ব্যক্তি 'বাইয়াত' গ্রহণে ফাঁকি দিয়েছিলো। সে হচ্ছে যাদ বিন কাইস বিন সখর, তদানীন্তন কালের প্রথম মুনাফিক। যাহোক, 'বাইয়াত গ্রহণের' এই অনুপম অনুষ্ঠানটি ইসলামের ইতিহাসে "বাইআতুর রিজওয়ান" নামে আখ্যায়িত এবং এইটিই হচ্ছে ইসলামের "যুদ্ধ ইতিহাসের সর্বপ্রথম সোনালী অধ্যায়ের সূচনাপর্ব।" হযরত ওসমান (রা.) এই সময় অনুপস্থিত ছিলেন বিধায় রাসূল (দ.) তাঁর (ওসমান রা.) পক্ষে স্বীয় পবিত্র একহাত অপর হাতের উপর স্থাপন করে 'বাইয়াত' গ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখ্য, এই সময়ে অনেক সাহাবী রাসূল কে (দ.) কাফেরদের সহযোগীদের বাড়িঘর আক্রমণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এতে হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহর রাসূল কে (দ.) যে আবেদন করেছিলেন তা ইসলামে যুদ্ধের দৃষ্টিভংগীর একটি অনন্য নিদর্শন। তিনি বলেছিলেন: "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হইনি। তবে যে কেহ আমাদের ও বায়তুল্লাহর মাঝে বাঁধা সৃষ্টি করবে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়বো।"

আল্লাহর রাসূল হযরত আবু বকরের পরামর্শটি সানন্দে গ্রহণ করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির পটভূমিতে যুদ্ধ বিষয়ক যেসব দিক নির্দেশনা পরিস্ফুট তা হচ্ছে :

www.pathagar.com

১. প্রত্যেক সামর্থবান মুসলমানকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে।
২. যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন যোদ্ধা কোন অবস্থাতেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে পারবে না।
৩. একমাত্র বাধাপ্রাপ্ত হলেই মুসলমান কোষমুক্ত তরবারী ধারণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।
৪. যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও এর কার্যক্রম নির্ধারণ পরামর্শক্রমে হতে পারে।
৫. শত্রুপক্ষের খবরাখবর সংগ্রহের জন্যে "চর" নিয়োগ যুদ্ধেরই একটি অপরিহার্য কর্মসূচি।

আল্লাহ্র রাসূলের (দ.) ১০ বছরের মদীনার জীবন যথার্থ অর্থে যুদ্ধ ও যুদ্ধাবস্থায় কেটেছিলো। মক্কার কুরাইশরা চুক্তিভংগ ও বিশ্বাসঘাতকতায় বেপরোয়া ও নির্লেজ্জভাবে সিদ্ধহস্ত। এদের সাথে মদীনার ইহুদীরা জোট বেঁধে আল্লাহর রাসূলকে মদীনা শরীফে সদা আতংকিত ও অতিষ্ঠিত অবস্থায় রেখেছিলো। প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা থেকে নির্যাতিত বেশে কপর্দকশূন্য অবস্থায় মদীনাতে হিজরত করার পর আল্লাহর নবীকে (দ.) বদর-ওহুদ-খন্দকসহ ২৮টি 'গাযওয়া' (নবীজির স্বয়ং নেতৃত্বে যুদ্ধ) এবং ৬০টি 'সরিয়্যা' (নবীজি কর্তৃক শত্রুর বিরুদ্ধে সৈন্যদের অভিযান পাঠান), সর্বমোট ৮৮টি যুদ্ধ ও যুদ্ধসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড গ্রহণ করতে হয়েছিল। এসব যুদ্ধাভিযানে অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তার মতে মুসলিম যোদ্ধাদের ২৫৯ জন শহীদ হন, আহত হন ১২৭ জন এবং বন্দী হয়েছিলেন মাত্র একজন সাহাবী। অপরদিকে শত্রুপক্ষের নিহত ও বন্দী হয়েছিলো যথাক্রমে ৭৫৯ ও ৬৫৬৪ জন। সংঘর্ষ এড়িয়ে রক্তপাত এড়ানো এই মানবিক চেতনা ও মূল্যবোধ, সর্বোপরি আক্রমণ নয় বরং আত্মরক্ষার জন্যে বাধ্য হয়ে আল্লাহর রাসূল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলেই মুসলমানের চেয়ে কাফেরদের যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি ছিল ভয়ঙ্কর। এই প্রসংগে মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমানদের সামরিক মেজাজ এবং আচরণটিও লক্ষণীয়। নিম্নে এর খানিকটা আলোকপাত করা হলো।

গ. রাসূল (দ.) এর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রকৃতি ও পরিসীমা

দীর্ঘ ১০টি বছর মদীনা শরীফে যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অহর্নিশি সতর্কতা সহকারে সংগ্রাম চালিয়ে যখন নবী করীম (দ.) বিজয়ীর বেশে সসস্ত্র সমস্ত সাহাবীদেরকে নিয়ে আপন মাতৃভূমি মক্কা নগরীতে প্রবেশ [২১শে রমজান, ৮ম

www.pathagar.com

হিজরী, জানু. ১১, ৬৩০ খ্রি.] করছিলেন, তখন তাঁর ও সাহাবীদের মনের অবস্থা কি ছিল তা একমাত্র তাঁরাই সম্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম যাঁরা আল্লাহর রাসূলের ১৩ বছর ব্যাপ্ত নির্যাতিত মক্কী জীবন ও ১০ বছর ব্যাপ্ত মদীনার সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস সুঅধ্যয়ন করেছেন। আল্লাহর নবী বীর সেনাপতি বেশে সদলবলে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেই স্বীয় সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে ঘোষণা দিলেন :

১. সাবধান! যে লোক অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করে, তাকে হত্যা করবে না।
২. যে লোক কাবাঘরে প্রবেশ করবে অথবা আবু সুফিয়ান ও হাকাম বিন হিসামের ঘরে প্রবেশ করবে তাকেও হত্যা করবে না।
৩. পলায়নপর ব্যক্তিদের পশ্চাদধাবন করবে না।
৪. আহত ও বন্দীদেরকে হত্যা করবে না।

এরপর তিনি জঘন্য ও ভয়ংকর অপরাধীদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর ও কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘোষণা করলেন :

> "লা তাসরীবা আলাইকুমুল ইয়াওমা ইযহাব উফা আন তুমুত তুরা কাউ"ঃ তোমরা আজ সবাই নিরপরাধী, তোমরা আজ মুক্ত, তোমরা নিজ নিজ গৃহে চলে যাও।" (সুফী নজর : মুহাম্মদ, পৃ: ১০)

অনুপম মানবতার সাক্ষাত রূপ নবীর এই ঘোষণায় কট্টর পাষাণ্ড কুরাইশগণের নয়ন যুগল অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল জোয়ার ভরা নদীর মতো। অনুতপ্ত চিত্তে বিনম্র নয়নে এরা সবাই রাসূলের দস্ত মোবারকে হাত রেখে ইসলামে দীক্ষিত হল।

এমনিভাবে বিশ্বনবী এবং গোটা আরব জাহানের সেনাধ্যক্ষ রাহমাতুল্লীল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (দ.) "যুদ্ধের বীজ ও ভাবনা, যুদ্ধের বীভৎষ পরিণাম ও আচরণ," তদানীন্তন কাফের ও মুশরিকদের চরিত্র ও মজ্জা হতে তিরোহিত করেন। আল্লাহর হাবীব যুদ্ধ সম্পর্কে কী আচরণ সৈন্যদেরকে শিক্ষা দিতেন এই প্রসংগে হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসটিও লক্ষ্যণীয়। তিনি বলেন, রাসূল পাক (দ.) সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বলেন, 'আল্লাহর নামে তাঁর উপর ভরসা করে দ্বীন ইসলামের সহায়তার জন্য রওয়ানা হও। কোন বৃদ্ধ, শিশু, মহিলাকে কখনো হত্যা করবে না। গণীমতের সম্পদ চুরি করবে না। সকলে একত্র হয়ে গণীমতের সম্পদ একত্র করে সকলের হকের প্রতি লক্ষ্য রেখে

www.pathagar.com

পরস্পর ন্যায়-নীতি অনুযায়ী বণ্টন করে নেবে। প্রত্যেকটি বিষয় ধর্ম ও সহিষ্ণুতার সাথে সমাধা করবে। কারণ আল্লাহপাক নেককারদের ভালোবাসেন।' তিনি অপর এক হাদিসে ব্যক্ত করেন, 'যখন তোমরা শত্রুর সাথে লড়াই করবে তখন ধৈর্য অবলম্বন করবে..।' এ প্রসংগে আরও একটি জরুরী কথা মনে রাখা দরকার। কাফের ও জালিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের সিদ্ধান্ত অথবা যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পদক্ষেপ রাসূল (দ.) আল্লাহর নির্দেশে নিয়েছেন। ফলে খেয়াল খুশীমতো বা মনগড়া সিদ্ধান্তে "যুদ্ধে" অংশগ্রহণ ইসলামের বিধানে নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে যেহেতু সব মানুষই হযরত আদম (আ.) এর অধস্তন, এজন্যে প্রতিটি মানুষের জীবন ও মর্যাদা আল্লাহর নিকট পবিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা হয়েছে, "যদি কোন ব্যক্তিকে হত্যা বা দেশে দুষ্কৃতি প্রসারের অভিযোগ ব্যতীত খুন করে, এটি (হত্যাকাণ্ড) যেন হবে গোটা মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল, এবং যদি কেউ কোন একটি জীবন রক্ষা করে থাকে (হত্যাকারী বা দুষ্কৃতিকারী ব্যতীত), তবে এটি হবে, সে যেন গোটা মানব জাতির প্রাণ রক্ষা করল।" (৫:৩৫)

এই প্রসংগে ইসলামে যুদ্ধের অনুমতি ও বিধান প্রদানের মূল উদ্দেশ্যটি সূরা হজ্জের ৩৯ থেকে ৪১ আয়াতে বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা এই প্রবন্ধের পূর্ববর্তী কোন এক পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে বলে তা এখানে পুনর্বার উদ্ধৃত করা হল না।

পরিশেষে রাসূল পাক (দ.) এর তরবারীর হাতলে যুদ্ধসংক্রান্ত যে নীতি-নির্দেশ ছিল এর উল্লেখ করেই এই প্রসংগের ইতি করছি। রাসূলের (দ.) তরবারীর হাতলে লিখা বা খোদাই করা ছিল :

১. জালিমকে ক্ষমা করবে।

২. তোমার সাথে যে সম্পর্কছেদ করে তার সাথে তুমি সম্পর্ক স্থাপন করবে।

৩. তোমার যে অনিষ্ট করে, তুমি তার উপকার করবে।

৪. নিজের বিরুদ্ধে হলেও সদা সত্য কথা বলবে।

[দ্রষ্টব্য: সূফী নজর মুহাম্মদ সাইয়াল: অনুবাদ : মুহাম্মদ রফিকুল্লাহ নেছারাবাদী, ই. ফা. বা. ১৯৮৬, পৃ: ৯৩]

উক্ত ৪টি নির্দেশ মেনে যে সৈনিক যুদ্ধ ময়দানে অবতীর্ণ হবে, সে নিশ্চয়ই মাটির পৃথিবীকে বেহেশতসম সুন্দর, সুশৃংখল ও নিরাপত্তার আবাসভূমিতে

www.pathagar.com

রূপান্তরিত করতে প্রতিশ্রুত! এ ধরণের সেনাবাহিনীই হচ্ছে বিশ্বশান্তি রচনার অপরিহার্য শক্তি ও আশীর্বাদ। ইসলামের যুদ্ধনীতি তথা "যুদ্ধ নয় শান্তি" নীতির বাস্তব দৃষ্টান্ত অবলোকনে প্রখ্যাত অমুসলিম ঐতিহাসিক টমাস আর্নান্ড তাঁর Preaching of Islam' গ্রন্থে এই মন্তব্য করেন যে: "Islam was spread because of the Truth and Beauty of its teaching and not because of war."-ইসলামের প্রসার ঘটেছে এর সত্য ও সৌন্দর্যের জন্য,' যুদ্ধের জন্য নয়।'

ঐতিহাসকি আরনল্ডের উক্ত মন্তব্য থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে ইসলামের যুদ্ধনীতি মানবিক, সহনশীল ও আত্মরক্ষামূলক হওয়ার জন্যেই অমুসলিমদের অনেকেই ইসলাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছেন। ইসলাম তরবারী ধারণ করেছে বটে, তবে তা মানবতা ও ন্যায়পরায়ণতা আবাদের সামরিক শিল্পকলা কৌশল হিসেবে, মানবতা ও মানব হত্যাকারীদের শায়েস্তার লক্ষ্যে। "ইসলামের যুদ্ধ ও সামরিক শক্তি"-কে যাঁরা ধর্ম-প্রচারের জবরদস্তি হাতিয়ার হিসাবে অপবাদ দিয়ে থাকে, তাদের মুখমণ্ডলে আরনল্ডের উক্ত উক্তি একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত সদৃশ, সন্দেহ নেই।

ঘ. যুদ্ধাবস্থায় শান্তি ও সৌহার্দ্য রচনায় শেখসাদীর নীতিমালা

এই প্রসংগে প্রখ্যাত পার্সী প্রতিভা শেখ সাদীর (রহ.) যুদ্ধাবস্থায় শত্রু পক্ষের সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্র রচনার সমরকৌশল জনিত উপদেশটুকু অভিনিবেশ সহকারে বিবেচ্য। নিম্নে এর বিস্তৃত উদ্ধৃতি সন্নিবেশ করা হলো।

"হামি তা বর্ আইয়াদ বতদ্‌বিরে কার্,
মাদার্ আয় দুশ্‌মন্ বে আজ্‌কারে জার্।
ছু না তাওয়াঁ আদূরে রা বকুয়াত্ শে কাস্ত্,
বা নেয়ামত্ বা-বাইয়াদ্ দরে ফেত্‌না বস্তু।"

অর্থ : চেষ্টা-তদবীর দ্বারা যদি কাজ সম্পন্ন করা যায়, তবে যুদ্ধের চেয়ে নম্র ব্যবহার উত্তম। যখন দেখা যায় যে, যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করা যাবে না, তখন উদারতা দ্বারা ফেতনা দূর করতে হবে। যদি তুমি মনে কর যে, শত্রু তোমার ক্ষতি করবে, তখন তার প্রতি দয়া দেখিয়ে তাকে বশীভূত করবে। শত্রুকে

www.pathagar.com

কাঁটার স্থলে ফুল বিছিয়ে দাও। কেননা, দানে শত্রুর দাঁতের তেজ কমে যায়, তদবীর ও তোষামোদ দ্বারা দুনিয়া হতে উপকার লাভ কর। যখন হাত কাটা সম্ভব নয়, তখন তাকে চুম্বন কর; সময় সুযোগ বুঝে শত্রু দমন করা উচিত। পুনঃ তার সাথে নম্র ব্যবহার করা চাই না। অধীনস্ত মানুষের সাথে লড়াই করো না। কেননা, অনেক সময় সামান্যটাই বড় বিশাল হয়ে দাঁড়ায়। যথা সম্ভব কারো মান-সম্মানের হানি করো না; অনেক সময় দুর্বলশত্রু বন্ধু হয়ে যায়। নিজের সৈন্যের চেয়ে অধিক সৈন্যের ওপর আক্রমণ করো না। তুমি যদি বীর ও নিপুন যোদ্ধা হও, তবে দুর্বলের সাথে যুদ্ধ করো না। তাতে বীরত্ব নষ্ট হয়ে যায়। তুমি যদি হাতীর ন্যায় শক্তি রাখ এবং বাঘ্রের ন্যায় আক্রমণ করতে পার, তথাপি সন্ধি করা উত্তম মনে করি। যখন সবরকম চেষ্টা তদবীর বিফল হয়ে যায়, তখন তরবারী উঠানো জায়েয আছে। যখন শত্রু সন্ধি করতে চায়, তখন তুমি ফিরে যেয়ো না এবং যখন যুদ্ধ করতে চায়, তখন ভয় পেয়ো না।

কেননা, লড়াইতে যদি শত্রু পালিয়ে যায়, তবে তোমার সম্মান ও বীরত্ব শতগুণ বেড়ে যাবে, যদি শত্রু লড়াইর জন্য অগ্রসর হয়, তবে তুমি তার প্রতিরোধ করতে লড়াই করলে রোজ হাশরে আল্লাহ তোমার হিসাব নিবে না। যখন শত্রুর সাথে বিবাদ চলতে থাকে, তখন তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক। কেননা, হিংসার ওপর দয়া করা অন্যায়। তুমি যদি ইতর ও যালেমের সাথে নম্র ব্যবহার কর, তবে তার অহঙ্কার বেড়ে যাবে। যদি শত্রু নম্র হয়ে তোমার দরজায় আসে, তবে তোমার মন হতে হিংসা, ক্রোধ, রাগ দূর করে ফেল। শত্রু যদি তোমার নিকট নিরাপত্তা কামনা করে, তবে তাকে দয়া কর। কিন্তু তার প্রতারণা হতে সাবধান থাক। বৃদ্ধলোকের পরামর্শ হতে ফিরে যেও না। কেননা, তাঁরা অনেক দিনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। কাঁসার দেয়াল যুবকেরা তরবারী দ্বারা কেঁটে ফেলতে পারে এবং বৃদ্ধের বুদ্ধি উৎপাটন করে ফেলতে পারে। যুদ্ধের সময় বাঁচার পথ ঠিক করে রাখবে। কেননা, তুমি জান না যে, জয়লাভ করবে, না পরাজয়। তুমি যদি দেখ যে, তোমার সৈন্যগণ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে, তখন নিজের প্রাণ রক্ষা কর। প্রিয় প্রাণকে ধ্বংস করো না। আর তুমি যদি যুদ্ধের বাইরে থাক, তবে তখনই প্রাণ রক্ষার্থে চলে যাবে। তোমার যদি হাজার সৈন্যও থাকে আর শত্রুর মাত্র দুশ', তথাপি রাতে শত্রুর রাজ্যে থাকবে না; যখন কোন সৈন্য কোন কাজে বীরত্ব প্রদর্শন করবে, তখন সে অনুযায়ী তার পদমর্যাদা

www.pathagar.com

বাড়িয়ে দিবে, তা হলে সে ভবিষ্যতে নিজের প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকবে। সে ইয়াজুজের সাথেও লড়তে ভীত হবে না। রাজ্যের সীমান্ত এলাকা সৈন্য দ্বারা পাহারা দিয়ে হেফাজত করবে। যে বাদশাহ সৈন্যদেরকে শান্তিতে রাখতে পারে, সেই বাদশাহ শত্রুর ওপর জয়যুক্ত হতে পারে। সৈন্যদেরকে উপযুক্ত বেতন-ভাতা না দিলে তারা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় না।

অভিজ্ঞ জ্ঞানীলোকের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবে। কেননা, পুরাতন বাঘ শিকারের অভিজ্ঞতা রাখে। বীর নিপূণ যোদ্ধার বিরুদ্ধে নিপুণ বাহাদুর যোদ্ধা প্রেরণ করবে। যে সৈন্যের বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে, তাকে দলে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করবে। তোমার রাজ্য যদি শৃঙ্খলার সাথে চালাতে হয়, তবে গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুবকদেরকে নিয়োজিত করো না। শিকারী কুকুর বাঘ দেখে কখনও ভয় পায় না। ... যুদ্ধের ময়দানে যে সেনা পিছ-পা হয়, তাকে হত্যা করে ফেলবে যদি শত্রু তাকে মেরে না থাকে। **বাদশাহর দু প্রকারের লোক খুব যত্ন সহকারে প্রতিপালিত করা চাই : বাহাদুর এবং গোপন কথা বা চুক্তি রক্ষক। যে ব্যক্তি কলম এবং তরবারী চর্চা করেনি, সে নিহত হলে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা চাই না। যে লোক শত্রুর কাজে ব্যবহৃত হয়, সে মানুষের মধ্যে পরিগণিত নয়। শত্রুর সাথে যুদ্ধ করায় ভয় নেই। কিন্তু সন্ধি-চুক্তি প্রস্তাব দিলে বেশি ভয় রাখতে হবে। কেননা, সন্ধি-প্রস্তাবের মাধ্যমে শত্রু অতর্কিত আক্রমণ করতে পারে।** ৲।

পরিণাম ফল চিন্তা করে শত্রুর সাথে নম্র ব্যবহার করা সম্বন্ধে সাদীর (র.) ধীসম্পন্ন বক্তব্যটি ও এখানে স্মরণীয়। তিনি বলেন :

বয়াত :

“চু শাম্‌শির্ পয়কার বর্ দাস্তি,
নোগাহ্ দার পেন্‌হাঁ রাতে আশ্‌তি।
কেলস্কর কাশুকানে মেগফার্ মেগাফ্,
নেহাঁ ছোলেহ্ জুইয়ান্দো পয়দা মছাফ।”

অর্থ : যখন শত্রুর সাথে যুদ্ধ বন্ধ কর, তখন গোপনভাবে সন্ধির পথে হুশিয়ার থাকবে। কেননা, সৈন্যেরা গোপন সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে প্রকাশ্যে সুযোগ পেয়ে আক্রমণ করে বসে। অতএব, **যুদ্ধের মাঝেই শত্রুসৈন্যের অন্তর পরীক্ষা করে দেখবে।** হতে পারে যে, সে পরাজয় স্বীকার করে তোমার পদানত হতে

www.pathagar.com

পারে। **শত্রুপক্ষের কোন যোদ্ধা যদি তোমার শিবিরে এসে পড়ে, তবে তাকে বিলম্বে হত্যা করো। হতে পারে, তোমার পক্ষের কোন নেতা তাদের হাতে আটক আছে।**

যদি তুমি শত্রুপক্ষের আহত সৈন্য মেরে ফেল, তবে তোমার সৈন্যও তুমি পাবে না। যদি কোন শত্রুনেতা তোমার হাতে আটকে পড়ে, তবে তুমি তার সাথে উত্তম ব্যবহার কর। তাহলে তোমার নিকট আরো সৈন্য আসবে। তুমি যদি গুপ্তভাবে দশজনের মন আকৃষ্ট করতে পার, তবে রাতে শতজনকে হত্যা করার চেয়ে উত্তম।

কোন শত্রু যদি নিজেই তোমার মিত্র হয়ে যায়, তবে তুমি তার সাথে মিশতে নির্ভয় হইও না। কেননা, সে যখন তার আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে করবে, তখন তার অন্তঃকরণ ঘায়েল হতে থাকবে। **দুশমনের মিষ্ট বাক্যকে মিষ্ট মনে করো না। যেহেতু মধুর মধ্যে বিষ থাকে।** ঐ ব্যক্তি শত্রুর শত্রুতা হতে রক্ষা পাবে, যে প্রকৃত বন্ধুকেও শত্রু বলে মনে করবে। থলেতে ঐ ব্যক্তি মুদ্রা নিশ্চিত নিরাপদে রাখতে পারে, যে সকলকে পকেটমার মনে করে। যদি কোন সৈন্য কোন নেতার নাফরমানি করে, তবে তাকে নিজের খাদেম বানিও না। কেননা, যে নিজের নেতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে জানে না, তখন সে তোমার কৃতজ্ঞ হবে না। তার বিশ্বাসঘাতকতা হতে সর্বদা সতর্ক থাক। তার কছম বা প্রতিজ্ঞার ওপর ভরসা করো না। নতুন শিক্ষার্থীর রশি ঢিলা করে দাও। কেটে দিলে দ্বিতীয়বার আর দেখবে না।

যখন তুমি শত্রুর হাত থেকে রাজ্য ছিনিয়ে আনবে, তখন তার প্রজাবৃন্দকে অধিকতর সুখে রাখবে। কেননা, শত্রু যদি দ্বিতীয়বার আক্রমণ করতে চায়, তবে প্রজারাই তাকে বাধা প্রদান করবে। বিরুদ্ধবাদীর সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। মীমাংসার কথা মনে মনে ভাববে; কখনও মুখে প্রকাশ করবে না। শত্রু দমনের জন্য তুমি যে পথ ও মত অবলম্বন করছ, তা কেউ টের পেলে তোমার বুদ্ধির কোন মূল্যই থাকবে না। তুমি উদার নীতি অবলম্বন কর, তবে সমস্ত দুনিয়া তোমার পদানত হবে। নম্র ব্যবহারে যখন কাজ হাসিল হয়, তখন উগ্র ব্যবহার দেখানোর কোন প্রয়োজন নেই। তুমি যদি চাও কারো মন কষ্ট না পায়, তবে ব্যথিত মনগুলো জেলখানা হতে বের করে দাও। শুধু শক্তি ও বাহুবলে সৈন্য শক্তিশালী হয় না। দুর্বলদের কাছে গিয়ে দোয়া নাও। **মযলুম দুর্বলদের দোয়া শক্তিশালী বাহুর চেয়ে বেশি কাজে আসে।**,

www.pathagar.com

[গুলিস্তা ও বুস্তাঁর সহজ অনুবাদ ; বঙ্গানুবাদ : মুস্তাফিজুর রহমান, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৫ইং মীনা বুক হাউস, বাংলাবাজার, পৃ : ২০৩ – ২০৫]

শেখ সাদী (র.) যদিও সৈনিক বা শাসক ছিলেন না, তবুও তিনি রাজ্য ও যুদ্ধ সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ঐশ্বরিকভাবে জ্ঞাত ও অভিজ্ঞ ছিলেন। এর প্রধান কারণ, তাঁর আল্লাহ্ ও তদীয় রাসুলের জ্ঞান ও আমল-আখলাক অনুশীলন। ফলে তিনি ছিলেন ঐশী আশীর্বাদ পুষ্ট ব্যক্তিত্ব।

৬. ইসলামে যুদ্ধাপরাধীর প্রতি আচরণ-নীতি

এখন War Criminals বা যুদ্ধাপরাধী প্রসংগ। এই ক্ষেত্রেও ইসলামের দৃষ্টিভংগী অপূর্ব ও অনন্য এবং দয়া ও মানবতার অতুলনীয় উপমা। ইসলামের সামরিক দৃষ্টিতে পরাজিত সৈনিক War Criminals বা যুদ্ধাপরাধী, আর বিজয়ী সৈনিক Ideal এবং Just warrior-আদর্শবান ও ন্যায়পরযোদ্ধা। এ ধরণের বিচার ও দৃষ্টিভংগী বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার জনক। এই নীতি ও মানসিকতা যুদ্ধোত্তর শান্তি ও শৃংখলা কায়েমের পথে সুপ্ত ও প্রকাশ্য হুমকির বীজই বপন করে। এক সময়ে জয়-পরাজয় নির্ধারিত যুদ্ধটির পুনরাবির্ভাবও ঘটায়। দৃষ্টান্ত : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান, ইটালী ও জার্মানীর পরাজিত বন্দী যোদ্ধাদেরকে War Criminals হিসাবে নিষ্ঠুর ও বীভৎসভাবে treat করায় তদানিন্তন শান্তির সংস্থা (!) জাতিপুঞ্জের (League of Nations) দাফন হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা এবং এর সমাপ্তি ঘটে পরাশক্তিপোষ্য জাতিসংঘের আত্মপ্রকাশে। দ্বিতীয়ত, War Criminals দের সাথে বিজয়ী "যুদ্ধবন্দী"দের বিনিময়ের বলতে গেলে আর কোন সুযোগই থাকে না। কারণ, পরাজিত পক্ষের বন্দীদেরকে War Criminals ভেবে বিজয়ী পক্ষ তাদেরকে হত্যা করতে পারে আশংকায় পরাজিত পক্ষও বিজয়ীপক্ষের বন্দীদেরকে হত্যা করতে পারে। অন্যকথায় Criminal হিসাবে আখ্যায়িত হওয়ার কারণে কোন পক্ষের বন্দী সৈনিকই "মানুষ" হিসাবে মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয় না একমাত্র ঘৃণ্য 'অনুকম্পা' ব্যতীত। এছাড়া যুদ্ধের সামরিক ও আদর্শিক দৃষ্টি এবং বিচার বিশ্লেষণে বন্দী সৈনিকদের শৌর্যবিধৃত চরিত্র, তাদের উত্তম গুণাবলীর স্বীকৃতি ও সেবা গ্রহণের পথও অবরুদ্ধ হযে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিটলারের Gaschamber ও Concentratoin camp-এ War Criminal-দের হত্যা ও Punishment

www.pathagar.com

প্রদানের বীভৎষ ইতিহাসটি। অথচ ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় বদরের যুদ্ধে বন্দী কাফেরদের অনেককে শিক্ষক হিসাবে মর্যাদা দিয়ে মুসলিমদের শিক্ষাদানের বিনিময়ে মুক্তি লাভের অনন্য ঐতিহ্য যা' বন্দী সৈনিকের মর্যাদা ও মানবিক মূল্যবোধের সোনালী ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে; প্রতিষ্ঠিত করেছে পরাজিত বন্দী সৈনিকদের অনুপম মানবিক মর্যাদা ও মূল্যায়নের পদ্ধতি।

দ্বিতীয়ত, বর্তমান তথাকথিত সভ্যদেশে সৈনিকদেরকে নৈতিকতা অপেক্ষা হিংস্রতা ও বর্বরতা, জাতীয়তাবাদ ও ভোগবাদের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। নাচ-গান-অশ্লীল ছায়াছবি ও যৌন-সম্ভোগ প্রদানের জন্য নাইটক্লাব সংস্কৃতি চালুর মাধ্যমে তাদের অশ্লীল চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফলে এসব সৈনিক বিজিত পররাজ্যে প্রবেশ করে সে দেশের নিরীহ-নিরস্ত্র ও অসহায় নাগরিকদের ধন-প্রাণ, সম্পদ ও সম্ভ্রমের সংরক্ষণ করার পরিবর্তে এর ধ্বংসযজ্ঞে ও ভোগ লিপ্সায় উন্মত্ত হয়ে পড়ে। এরা animality বা পশুত্বকে জাগ্রত করে স্বীয় morality ও conscious কে পরাভূত করে রাখে, বিজিত দেশে সৃষ্টি করে এক নারকীয় নৈরাজ্য ও বন্যপরিবেশের। উদাহরণ-সাম্প্রতিক ইরাকসহ কসোভো, কাশ্মীর, বসনিয়ায় হত্যাযজ্ঞ ও নারী ধর্ষণের দৃষ্টান্তসমূহ। প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের সৈনিকরাই War Criminal বটে; কারণ এরা নিরীহ ও নিরস্ত্র এবং বেসামরিক জনগণের প্রতি বর্বরতা ও হত্যাযজ্ঞের অপরাধ করছে। তাই এদেরই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হতে হবে। কারণ তাদের অপরাধে সামরিক শৌর্যবীর্যের অমর্যাদা ঘটে পাশবিক ও বীভৎষ আচরনে।

সারকথা, ইসলামে যুদ্ধ একটি ইবাদত, সুকঠিন ইবাদত নৈতিক ও চারিত্রিক সীমারেখা ও নিয়ন্ত্রণের কারণে। মুসলিম যোদ্ধাদের নিকট এহেন মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী আরো পুত-পবিত্রতা অর্জন করে যুদ্ধ ময়দানে 'শাহাদাত'বরণের বা 'গাজী' উপাধি লাভের অনুপ্রেরণায়; কারণ স্বয়ং আল্লাহপাক "বেহেশত" এর ঘোষণা দিয়েছেন তাদের জন্য। "শহীদ" ও "গাজী" এই দুটো পরিভাষা আল্লাহর করুণা ও মহিমায় বিভূষিত, বেহশতী জ্যোতির ফল্লুরশ্মীতে উদ্ভাসিত। "যুদ্ধ" সম্পর্কে ইসলামের এই আদর্শ যেখানে পরীক্ষিতভাবে উপস্থাপিত ও ভবিষ্যতের জন্য পূর্ণ প্রেরণার দিক-নির্দেশক, সেই ইসলামের দৃষ্টিতে 'War Criminals' কথাটি শুধু নিষ্ঠুর ও জঘন্যের প্রতীকই নয়, বরং এটি ঘৃণ্যভরে দাফনযোগ্যও।

www.pathagar.com

চ. মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মর্যাদা ও অধিকার

এই প্রসংগে মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত অবশ্যি অপ্রাসংগিক নয়। এতে "ইসলামে যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি" রক্ষার দৃষ্টিতে অমুসলিমরা যে কত নিরাপদ ও মর্যাদাভিষিক্ত ভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করেন তা সম্যক হৃদয়ঙ্গম হবে নিঃসন্দেহে! তাই প্রাসংগিক বিবেচনায় বিগত ২৯/০৩/০৬ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকের ধর্মচিন্তা ক্রোড়পত্রে ইবনে মফিজের "মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার" শীর্ষক প্রবন্ধটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

ইসলামী রাষ্ট্রে যে সব অমুসলিম বসবাস করে তাদেরকে যিম্মী বা মুআহিদ বলে। এ সব অমুসলিমদের জান-মাল, হিফাজতের অধিকার এবং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও নাগরিক অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। অমুসলিমদের অধিকারসমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান অধিকার হল প্রাণ রক্ষার অধিকার। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন "মান ক্বাতালা মুআহিদান লাম ইয়ারিহ্ রায়িহাতাল জান্নাত ওয় ইন কানা রিহুহা তুযাদু মিন মাছীরাতে আরবায়ীনা খারীফান।" অর্থাৎ, যদি কোন ব্যক্তি মুআহিদ বা যিম্মীকে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে। তিনি আরো ইরশাদ করেন :

"কোন মুসলিম যদি কোন মুআহিদ বা যিম্মীর প্রতি যুলুম করে, কিংবা তাকে তার অধিকার থেকে কম দেয়, কিংবা ক্ষমতা বর্হিভূত কোন কাজ তার উপর চাপিয়ে দেয়, বা স্বতঃস্ফূর্ততা ছাড়া তার থেকে কোন মাল নিয়ে যায় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব এবং জয়ী হব।"

যিম্মী হত্যা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কোন মুসলমান যদি কোন যিম্মীকে হত্যা করে তাহলে বিনিময়ে তাকেও হত্যা করা হবে।

নবী (সাঃ) যিম্মী হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারী মুসলিম ব্যক্তিকেও হত্যা করেছেন। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম রাষ্ট্রে একজন অমুসলিম ব্যাক্তির প্রাণ একজন মুসলিমের সমান, একারণেই একজন অমুসলিম নাগরিকের রক্তপণ একজন মুসলিম নাগরিকের রক্তপণের সমান ধার্য করা হয়েছে।

নবী করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় আমীর ইবনে উমাইয়া নামক এক ব্যক্তি আমীর গোত্রীয় দুজন মুআহিদকে (যিম্মী) অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে রাসূল (সাঃ) তাদেরকে দিয়্যত (রক্তপণ) মুসলমানদের সমান প্রদান করতে আদেশ দেন।

www.pathagar.com

যিম্মীদের সম্পদ আত্মসাৎকারীর উপর রাসূল (সাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারি আরোপ করেছেন। ইসলাম মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম যিম্মীদেরকে তাদের ধর্ম ও কৃষ্টি-কালচার রক্ষার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতাদান করেছে। ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যেসকল বিজিতদেশে অমুসলিম লোকদেরকে বসবাসের অধিকার দেয়া হয়েছিল সেসকল দেশে তাদেরকে তাদের স্ব স্ব ধর্ম পালন ও কৃষ্টি-কালচার রক্ষার অধিকারও দেয়া হয়েছিল।

আবু উবায়দা (রাঃ) কিতাবুল আমওয়াল নামক গ্রন্থে পরাজিত কতেক দেশের নাম উল্লেখ করে বলেন, এ সকলদেশের অধিবাসীরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাদের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। অথচ এসব দেশের অমুসলিম অধিবাসীদেরকে তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে পূর্ববৎ বহাল রাখা হয়েছে।

অমুসলিম ব্যক্তির সামাজিক ও নাগরিক অধিকারও ইসলামী রাষ্ট্রে স্বীকৃত। ইসলামী রাষ্ট্রের যেসব অমুসলিম অধিবাসী জীবিকা উপার্জনে অক্ষম তাদেরকে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফতকালে খালেদ (রাঃ) হিরার অধিবাসীদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন তাতে ছিল "তোমাদের যে ব্যক্তি বৃদ্ধ হয়ে কর্মে অক্ষম হয়ে যাবে; অথবা অন্য কোন কারণে বিপদগ্রস্ত; অথবা অন্য কোন কারণে বিপদগ্রস্ত হয়ে যাবে তার জিযিয়া মাওকুফ করে দেয়া হবে। অধিকন্তু বাইতুল মাল হতে তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।"

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাঃ) একবার এক অমুসলিম ভিক্ষুককে ভিক্ষা করতে দেখে নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং তাকে কিছু দান করলেন। তারপর তাকে বাইতুল মালের খাজাঞ্চির নিকট পাঠিয়ে আদেশ দিলেন তাকে এবং তারমতো অন্যান্য ব্যক্তির জন্য বাইতুল মাল থেকে বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিতে। যৌবনে তাদের থেকে জিযিয়া উসুল করে বার্ধক্যে তাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ন্যায় বিচার নয়।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের চাকরি লাভ করারও বিশেষ অধিকার রয়েছে। খোলাফায়ে রাশিদীনের যামানায় এই ধরনের দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া যায়। হযরত উমর -এর সময়কালে মিসরের একটি নদীর নকশা একজন অমুসলিম ইঞ্জিনিয়ার তৈরী করেছিলেন। এমনিভাবে কুফার জনৈক শাসকর্তা রুযবান নামক একজন অমুসলিম কারিগর দ্বারা কুফার বাইতুল মালখানা পুনঃনির্মাণ করান এবং তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে মদীনায় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট তাকে প্রেরণ করেন। হযরত উমর (রাঃ) বায়তুল মাল হতে তার জন্য আজীবন বৃত্তি নির্ধারণ করে দেন।

www.pathagar.com

ছ. ইসলামে হত্যার বিচার ও পরিণতি

ইসলাম হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবে প্রকৃত শান্তির ধর্ম। ব্যক্তিজীবন থেকে আরম্ভ করে সকল পর্যায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের লক্ষ্য। সমাজ ও দেশে যাতে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা হয় এর জন্য মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য বিধি বিধান দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ঐ বিধান বাস্তবায়িত হলে সকলেই এর সুফল ভোগ করতে সক্ষম হয়। ফলে সমাজে কোন রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর থাকে না।

পবিত্র কুরআন এবং হাদীস সমূহের প্রাসাংগিক উদ্ধৃতি ও এগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লক্ষণীয় :

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিবসে মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম খুনের বিচার করা হবে। যদি দু'জন মুসলমান তরবারী বা অস্ত্র নিয়ে মুখোমুখি হয় এবং হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তবে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামী হবে। কারণ, নিহত ব্যক্তিও হত্যাকারীকে হত্যায় উদ্ধুদ্ধ করেছে" (মুসলিম)। তিনি আরও বলেছেন, "সব থেকে বড় গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং মানুষ হত্যা করা।"

"যে ব্যক্তি মরণাস্ত্র দিয়ে নিজেকে হত্যা করবে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে।" মহান স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ মানুষ ছাড়াও অন্য সব সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ করারও আদেশ করা হয়েছে। পোষা প্রাণীকে খাবারের কষ্ট দেওয়াও নিষেধ, এমনকি ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে জবাহ করা, জীবকে পুড়িয়ে মারা নিষিদ্ধ। বিনা প্রয়োজনে গাছের পাতা পর্যন্ত ছেঁড়া যাবে না।"আল্লাহর সৃষ্ট সকল প্রাণী নিয়ে তার পরিবার। তিনিই আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয়, যিনি আল্লাহ সৃষ্ট প্রাণীদের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেন।" "খাটি মুসলিম সেই, যার রসনা ও হস্ত হতে মানবজাতি নিরাপদ।" বৃহত্তম অপরাধগুলো হচ্ছে কাহাকে আল্লাহর অংশীদার করা, বাপ-মাকে হয়রান করা, নরহত্যা, আত্মহত্যা এবং মিথ্যা শপথ।"

রাসুল (সাঃ) ছিলেন স্বল্পভাষী, দৃঢ়চিত্ত, আকর্ষণীয়, বিস্ময়কর, বুদ্ধিদীপ্ত, বলিষ্ঠদেহ ও সুন্দর মুখাবয়বর অধিকারী। সাধারণের মত গৃহকর্ম করতেন। দীন দরিদ্রের মত জীবন যাপন করতেন। খিলাল, আয়না, চিরুনী, আতর ব্যবহার করতেন। তিনি ছিলেন ফুলের মত পরিচ্ছন্ন, পবিত্র, সুন্দর মানসিকতার ধারক।

www.pathagar.com

ফুল সম্পর্কে তার গভীর অনুরাগের প্রকাশ তাঁর কোমল মনের অনিন্দ্য সুন্দর অনুভুতির ইঙ্গিত বহন করে। "যদি জোটে মোটে একটি পয়সা/খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি, দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে/ ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী।" রাসূল (সাঃ) উম্মতদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দুটি জিনিসকে আঁকড়ে রাখবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হল আল কুরআন আর অপরটি হল আমার সুন্নাহ। এই অনুপম পথ-নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি

প্রণীকুলের চেয়েও নিম্নস্তরে নেমে গেছে যুদ্ধ-হিংসা-হত্যায় মানব সমাজ। মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহর উপর ঈমান আনার পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হচ্ছে মানুষকে ভালবাসা। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ইবাদত হচ্ছে মানুষকে ভালবাসা।" তিনি আরও বলেছেন, "কাবা ঘর জ্বালিয়ে দিলে, কুরআন পুড়িয়ে দিলে যে গুনাহ হয় তার চেয়ে বড় গুণাহ হচ্ছে মানুষকে কষ্ট দেয়া।" তাই নিরীহ মানুষকে হত্যা করে, জখম করে, জাতীয় সম্পদও বিচার ব্যবস্থা ধ্বংস করে পেশাজীবিদের হত্যা করে কখনও ইসলাম কায়েম হতে পারে না। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করছে, দেশকে অস্থিতিশীল করে আগ্রাসী [পশ্চিমা] শক্তিকে সন্ত্রাস দমনের নামে ভিন দেশে অনুপ্রবেশের পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে। গণতন্ত্রের ঈপ্সিত অবদানের অভাব, দুর্নীতির বিস্তৃত থাবা, আইনের প্রয়োগে অপ্রতুলতা, রাজনৈতিক বিভাজন তথা পরসমতসহিষ্ণুতার অভাব, পরস্পরের প্রতি বিষোদগার ইত্যাদির ফলে সৃষ্ট অস্থিতির সুযোগে আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীরা দেশীয় কিছু অর্থগৃধ্নু বিকৃতমনা অপরিপক্ক অর্ধশিক্ষিত লোককে ব্যবহার করে মানবতা, গণতন্ত্র, ইসলাম তথা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন করছে। পাক কালামে বলা আছে, "যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মুসলমানদেরকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম; তাতেই সে চিরকাল থাকবে।"(নিসা : ৯৩)

মহানবীর (সাঃ) আদর্শই বিশ্বশান্তি পুনঃস্থাপনের একমাত্র উপায় :

"পরকালে রয়েছে যোগ্য পুরস্কার। সেই আখেরাতের ঘরতো আমি তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখে দেব যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য দেখায় না এবং ফাসাদ সৃষ্টি করে না। আর শুভ পরিণাম তো তাদের জন্যই যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে" (সূরা আল-কাছাছ-৮৩)। একটি ভারসাম্যপূর্ণ সুষম জীবনাদর্শন উপহার

www.pathagar.com

দেওয়ায় বিশ্বনবী সম্পর্কে মাইকেল এইচ হার্টের মত একজন অমুসলিম মনীষী "দি হানড্রেডস" গ্রন্থে বলেছেন "মহানবী (সাঃ) একাধারে একটি ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ মানবজাতিকে উপহার দিয়েছেন।" নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক ও দার্শনিক জর্জ বার্নাডশ বলেছেন, "ইসলামই একমাত্র ধর্ম ব্যবস্থা যা পৃথিবীর সব যুগের সব সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম।" ডঃ মরিস বুকাইলী 'বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান' গ্রন্থে বলেন, "মুহাম্মদ (সাঃ) একজন নিরক্ষর রাসূল ছিলেন কিন্তু তার উপস্থাপিত জীবনাদর্শন আল ইসলাম ও আল কুরআন আল্লাহ্ প্রদত্ত এবং তা অবিকৃত অবস্থায় সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে মানব সমাজে সংরক্ষিত আছে।" বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শবাদী মহামানবরূপে তাঁকে তিনি আখ্যায়িত করেছেন। কালজয়ী পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের প্রবর্তক আখেরী নবী মানবাধিকার অর্জন ও সংরক্ষণে আপোষহীনভাবে সংগ্রাম করেছেন। ৬২২ খৃষ্টাব্দে প্রণীত মদীনা সনদ প্রকৃত অর্থেই মদীনায় বসবাসরত সকল ধর্ম-বর্ণ ও গোত্রের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করেছে এবং আনসার ও মোহাজিরদের মিলিত প্রয়োগের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূল (সাঃ) ইসলামের পরিপূর্ণতা, মর্মার্থও অনুধাবনের তাগিদ করেছেন এবং সেখানেও বলেছেন "একজন মুসলমানের রক্ত অপর মুসলমানের জন্য হারাম। অধিকন্তু কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করা অবৈধ।" দয়া-দাক্ষিণ্য, উদারতা, সহমর্মিতা ও সদাচরণসহ যাবতীয় মানবিক গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক নবীজী ন্যায়বিচারের প্রশ্নে ছিলেন অটল। মাখযুমী গোত্রের এক মহিলা চোরের হাত কাটার প্রশ্নে হযরত উসামা (রাঃ)-এর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাসুল (সাঃ) জবাব দেন, "আল্লাহর কসম! মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে তার হাত কর্তিত হবে।" সংঘাতময় ও যুদ্ধ-বিপন্ন পৃথিবীতে শান্তির প্রশ্নে মহানবীর প্রদর্শিত আলোই একমাত্র পথের দিশারী। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অধ্যাপক হিট্টির উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। মুহাম্মদ (সাঃ) কে যদি দুনিয়াবাসী একমাত্র নেতা মেনে নেয়, তাহলে তাঁর দ্বারাই সম্ভব সকল সমস্যার সমানধানপূর্বক পৃথিবীতে শান্তি পুনঃস্থাপিত করা।"

www.pathagar.com

জ. ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস

সন্ত্রাস প্রসংগে ইসলামের নির্দেশ কি তাও বিচার্য। এটিও যুদ্ধের অন্যতম কারণ। ইতিহাস সাক্ষী 'হিলফুল ফুযুল' সংগঠন প্রকৃতপক্ষে একটি সন্ত্রাসবিরোধী ও সন্ত্রাস উচ্ছেদের কার্যকরী সংগঠন ছিল। এই সংগঠনের ১নং শর্তে বর্ণনা করা হয় :

"আল্লাহর কসম! মক্কা নগরীতে কারো উপর অত্যাচার হলে আমরা সবাই মিলে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাহায্য করব। চাই সে উঁচু শ্রেণীর হোক বা নিচু শ্রেণীর, স্থানীয় হোক বা বিদেশী। অত্যাচারিতের প্রাপ্য যতক্ষণ পর্যন্ত না আদায় হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এভাবেই থাকব।"

দ্বিতীয়ত, অত্যাচারিত ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মক্কার মুসলমানগণ যখন মোহাজের হিসাবে মদীনায় আনসারদের সাহায্য ও ত্যাগতিতীক্ষায় বসবাস শুরু করেন, তখন সেখানকার সন্ত্রাসী, কুচক্রী ইহুদী ও অন্যান্য বৈরী অমুসলিমদেরকে সংযত ও অনুগত রাখার জন্য "মদীনা সনদ" প্রণীত হয় যা একটি অনন্য সন্ত্রাস বিরোধী পদক্ষেপ বিশেষ। এই সনদের মূল লক্ষ্যগুলো সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও উৎপাটনের ক্ষেত্রে সামরিক কলা-কৌশলে কতই না শক্তিশালী ও কার্যকরী বিধান ছিল তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সনদে উল্লেখ করা হয় :

১. মদীনার নিরাপত্তা বিধান করণ
২. জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে দেশের কাজে লাগান
৩. সকল সম্প্রদায়কে নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা প্রদান
৪. মদীনায় নরহত্যা হারাম ঘোষণা
৫. ব্যক্তির অপরাধের জন্য ব্যক্তিরই বিচার হবে; গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে দায়ী করা যাবে না। ইত্যাদি।

এই সনদের মাধ্যমে চোরাগুপ্তা হামলা ও হত্যা, সম্প্রদায়িকতার প্ররোচনা, নরহত্যার প্রবণতা ইত্যাদির অবসান ঘটে। ফলে সোনার মদীনা শুধু একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি; বরং গোটা বিশ্বের জন্য সামরিক প্রজ্ঞা বিধৃত চিরন্তন শান্তি ও নিরাপত্তার রাষ্ট্রীয় আদর্শের উৎস ও প্রতীক হিসাবে সমাদৃত জাতি-ধর্ম-বর্ণ এবং আদর্শ নির্বিশেষে।

সন্ত্রাস দমনে ইসলাম কী ধরনের শাস্তি প্রদানের দৃষ্টান্ত রেখেছে এর একটি উদাহরণও এখানে মডেল হিসেবে উল্লেখ করা হল :

একবার উক্ল ও উরায়না গোত্রের একদল লোক নবী (সাঃ)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় তারা অসুস্থ

www.pathagar.com

হয়ে পড়ল। তাদের পেট ফুলে গেল এবং শরীর হলুদ হয়ে গেলো। মহানবী (সাঃ)কে তাদের এ অবস্থা জানোনো হলে তিনি তাদেরকে সাদকার উটের চারণভূমিতে গিয়ে উটের প্রস্রাব ও দুধ পান করতে বললেন। সেখানে গিয়ে তারা সাদকার উটের প্রস্রাব ও দুধ পান করে সুস্থ হয়ে উঠলো। অতঃপর তারা উটের রাখাল নবী (সাঃ)-এর আযাদকৃত দাস ইয়াসারকে হত্যা করল। এক বর্ণনা মতে প্রথমেই তারা কাঁটা দিয়ে ইয়াসারার চোখ নষ্ট করে দিয়েছিল। অতঃপর উটগুলো নিয়ে তারা পলায়ন করে। সকালের দিকে মহানীব (সাঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি তাদের সন্ধানে লোক পাঠালেন। অনুসন্ধানকারীরা দুপুরের দিকে তাদেরকে পাকড়াও করে নিয়ে এলেন। অতঃপর নবী (সাঃ)-এর নির্দেশে তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হল। চোখ উপড়ে ফেলা হল এবং এমতাবস্থায় মরুভূমির তপ্তরোদে ফেলে রাখা হল। এ অবস্থায়ই তারা মৃত্যুবরণ করল। এই শাস্তির প্রচণ্ডতা এমন ছিল যে, তারা পানি চাচ্ছিল, কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হচ্ছিল না। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হল- "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মককার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে। (আল কুরআন-৫ঃ৩৩)

সমাজ ও রাষ্ট্রে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্পাক যে সব সতর্কবাণী ও হুশিয়ারী দিয়েছেন তা সন্ত্রাস দমনে কতই না কঠোরও অনুপম বিধান বিশেষ। অন্যত্র, আল্লাহ্পাক বলেন :

দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ঘটাবেনা। (৭:৫৬) ✓

শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নকারী সন্ত্রাসীদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ্পাক বলেন যে, যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে। জীবজন্তর বংশ ধ্বংসের চেষ্টা করে; কিন্ত আল্লাহ্ অশান্তি পছন্দ করেন না। লক্ষণীয়, এ ধরনের মানুষগুলোই ফিত্না সৃষ্টি করে, অশান্তি ছড়িয়ে শান্তি ও সমৃদ্ধিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে চরমভাবে সমাজে। আল্লাহ্ বলেন, প্রকৃত পক্ষে এরাই হচ্ছে চরম লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত এবং এদের জন্য রয়েছে নিষ্ঠুর শাস্তি যার বিরতি নেই, যা অনন্ত ও চিরন্তন।

সন্ত্রাস যাতে সমাজে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পরে, সেজন্য আল্লাহর নির্দেশ :

www.pathagar.com

যখন মোমেনদের মধ্যে মতভেদ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তখন যেন তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে মীমাংসায় উপনীত হয়। বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণ সন্ত্রাসের মূল উৎপাটনেরও একটি অমোঘ নির্দেশ বিশেষ। এতে আল্লাহ্র রাসূল কতিপয় ঘোষণা দেন যেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে :

১) শিরক করোনা (এ থেকে ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয় ব্যাপকভাবে)
২) হক ব্যতীত কাউকে হত্যা করো না (সুতরাং নিছক ক্রোধ বা প্রতিহিংসায় হত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়)
৩) পরদ্রব্য চুরি করোনা (সন্ত্রাসের এটি ও অন্যতম কারণ)
৪) ব্যভিচার করোনা (যা ধর্ষণ ও নারী হত্যা ও পারিবারিক জীবনে ধ্বংসের পথ রচনা করে)

পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের আরো কতিপয় উদ্ধৃতাংশ দিয়ে এই প্রসংগের ইতি টানছি। প্রকৃতপক্ষে জিহ্বা বা জবানের সন্ত্রাস সৃষ্টির উৎস হিসাবে সমাজের ভিত্ ধ্বংস রচনায় মারাত্মক প্রভাব রাখে। পাক কোরআনে আল্লাহ এরশাদ করেন :

"হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে, এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান আনায়নের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরণের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই জালিম। হে মুমিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দুরে থাকো, কারণ অনুমান কোন ক্ষেত্রে পাপ, এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না, এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেহ তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই মনে করো, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু।" (৪৯ : ১১-১২)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : মহানবী (সাঃ) শত্রুদের প্রতি প্রেরিত সৈনিকদের উদ্দেশে বলতেন, "আমাদের প্রতি কৃত ক্ষতির প্রতিশোধ নিতে যেয়ে গৃহাভ্যন্তরে ক্ষতিহীন বাসিন্দদের গায়ে হাত দিও না, নারীদের অক্ষমতার সম্মান কর, দুগ্ধপোষ্য শিশু আর রোগশয্যার মানুষকে আঘাত করো না। বাধা প্রদান করে না এমন অধিবাসীদের বাসগৃহ ভেঙ্গে দিও না, তাদের জীবন ধারণের উপকরণসমূহ

www.pathagar.com

ও ফলের গাছ নষ্ট করো না, খেজুর গাছের ক্ষতি করো না।" তিনি আরও বলতেন, "যে ব্যক্তি যিম্মির প্রতি অন্যায় ব্যবহার করবে এবং সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেবে আমি পরলোকে তার জন্য অভিযোগকারী হব।"

অন্য কথায় এই আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলামের প্রতিটি যুদ্ধই প্রতিরক্ষামূলক এবং ব্যতিক্রম হিসাবে মাত্র দু'একটি শায়েস্তা বা প্রতিবিধানমূলক অভিযান ছিল। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কতিপয় সার্বজনীন মূলনীতি ও নির্দেশ নাযিল হয়েছে বিশ্বমানবতার অদ্বিতীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর ওপর। কতিপয় ঐতিহাসিক যুদ্ধের মূলনীতি ও নির্দেশাবলীর নাযিল হওয়ার প্রাসংগিক ভূমিকাসহ প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ পরবর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণনা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে এই পরিচ্ছেদের ইতি এখানেই।

[অনুসন্ধিৎসু পাঠককুলের আরো অবগতির জন্য পবিত্র কোরআন থেকে কতিপয় আয়াতের অনুবাদ ও সংশ্লিষ্ট সংকেত এতদসংগে উল্লেখ করা হলো :

আনফাল (৮:৯) স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিয়েছিলেন, "আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো এক সহস্র ফেরেশতার দ্বারা, যারা একের পর এক আসবে।" (বদরের যুদ্ধ প্রসঙ্গ)

এই সুরার ১২নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেন তারা যেন মুমিনদেরকে দৃঢ় রাখে এবং আশ্বাস দেন তিনি কুফরী যারা করে তাদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করে দেন; "সুতরাং তোমরা আঘাত কর তাদের স্কন্ধে ও আঘাত কর তাদের প্রত্যেকের আঙ্গুলের অগ্রভাগে।"

এই সুরার ১৫ ও ১৬নং আয়াতে মুমিনদেরকে কাফিরদের সম্মুখীন হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করার নির্দেশ দিয়েছেন; কারণ পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী আল্লাহ্র বিরাগভাজন হবে ও তার আশ্রয় হবে জাহান্নাম-নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।

এই সুরার ১৭নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন : "তোমরা তাদেরকে হত্যা কর নাই, আল্লাহ্ই তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং তুমি (রাসুল স.) যখন নিক্ষেপ করেছিলে (এক মুষ্টি কংকর) যা শত্রুদের চোখে পতিত হয়), তখন তুমি নিক্ষেপ করনি, আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন।"

[এমনিভাবে সুরা আনফাল এর বিশেষ করে ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৫০, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫।

এবং

সুরা তাওবা-এর ১, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২০, ২৪, ২৫, ২৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৭৩, ৮১, ৮৪, (মোনাফিকদের কবর জিয়ারত)

৮৬, ৮৮, ৯০, ১১১, ১২২, ১২৩, ১২৯ (দ্রষ্টব্য)]

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামে যুদ্ধনীতি : নাযিলের পটভূমি নির্দেশনা

ক. প্রাসংগিক পটভূমি

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও তদীয় সঙ্গীবৃন্দের দীর্ঘ ১৩ বছর মক্কায় প্রচণ্ড বিরোধিতা নিষ্ঠুর অত্যাচার নিষ্পেষণে যখন ওষ্ঠাগত প্রাণ, তখন আল্লাহপাক তাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে আরোপিত যুদ্ধের মোকাবেলা করার অনুমতি দান করলেন। "যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যা'রা আক্রান্ত হয়েছে কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। (সুরা হা-৩৯) **যেই মুহূর্তে এই আয়াত নাযিল হল, সেই মুহূর্ত থেকেই যুদ্ধের নীতি ও নৈতিকতা মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় হিসাবে অবধারিত হতে লাগলো**। আল্লাহর রাসূল নিম্ন বিধিসমূহ পালনীয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করলেন :

১) প্রাথমিক অবস্থায় আত্মরক্ষামূলক ও পরে জরুরীভত্তিতে খেলাফত কায়েমের স্বার্থে প্রয়োজনে আক্রমণাত্তক যুদ্ধ অনুমোদনযোগ্য।

২.) আত্মরক্ষার জন্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনুমোদন প্রাপ্ত।

৩. শেষ অবলম্বন হিসাবেই যুদ্ধ বিবেচ্য।

৪. উদ্ভিদ, প্রাণীজগত এবং পরিবেশ বিনষ্টের জন্য দুষ্কৃতিকারীই দায়ী।

৫) অযোদ্ধা নিরীহ জনসাধারণকে অবশ্যই রক্ষা ও নিরাপত্তাদান করতে হবে।

৬.) আহতদেরকে হত্যা করা যাবে না।

৭.) কোন ভাবেই মৃতদেরকে অবমাননা করা চলবে না।

৮. সব ধর্মকে সম্মান করতে হবে।

www.pathagar.com

৯. শান্তির আলোচনার উদ্যোগকে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে।

১০. প্রত্যক্ষ করা হয়েছে বা অবলম্বন করা হয়েছে এরূপ সাক্ষ্যদানকে অবশ্যই মর্যাদা দিতে হবে।

১১. যুদ্ধবন্দীদেরকে অবশ্যই রক্ষা করা হবে।

১২. সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করা ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করার অধিকার নেতাদের রয়েছে।

১৩. যুদ্ধের সমুদয় সম্পদ ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির বণ্টন কোরআনের বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

মোটামোটি উক্ত ১৩টি কঠোর নির্দেশনার আলোকে হযরতের জীবদ্দশায় যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘঠিত হয়েছিল সেগুলোর কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে নতুন আংগিকে উল্লেখ করা হল, যা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যাবে প্রকৃত অর্থে ইসলামে যুদ্ধ কতই না মানবতাসিক্ত ও মায়ামতায় পরিপুষ্ট; বস্তুতান্ত্রিক ও আত্মিক তথা আধ্যাত্মিক চিন্তা ও চেতনায় কঠোরভাবে কতই না অলংঘনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রেষণায় পরিবৃত্ত।

খ. বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গ (২য় হিজরী, ৬২৪ খ্রি.)

বদর প্রান্তে সংঘটিত যুদ্ধ মুসলমানদের আস্তিত্ব ও আদর্শের প্রতি সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশী হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর সেনাবাহিনী ছিল কাফেরদের সৈন্যসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের ও কম। অস্ত্রসস্ত্রে দুর্বল। দুজন অশ্বারোহীসহ সর্বমোট প্রায় ৩০০ জনের সৈন্য নিয়ে তিনি সুসজ্জিত ৭০ জন অশ্বরোহীসহ ১ হাজারের ও বেশী কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছিলেন। এই যুদ্ধে আল্লাহ্‌র সরাসরি সাহায্য ছিল। সুরা আল ইমরানে এর উল্লেখ রয়েছে এই ঘোষণয় : আর বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীণবল ছিলে আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৩ : ১২৩) সুরা আনফালে এই সাহায্য দানের বর্ণনা দেয়া হয় নিম্নভাবে :

"স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে। তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিয়েছিলেন (প্রার্থনা কবুল করেছিলেন), আমি তোমাদের সাহায্য করে এক সহস্র ফেরেশতা দ্বারা, যারা

www.pathagar.com

একের পর এক আসবে।" (৮:৯) ইসলামের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রচণ্ডতম সংঘর্ষ। এই যুদ্ধের প্রাক্কালেই আল্লাহপাক প্রথম যুদ্ধের আয়াত নাযিল করেন সদা হিংস্র ও জীঘাংসাবৃত্তি-পরায়ণ কাফেরদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্র ধারণের। কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত সূরা আনফালে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন : "ইয়া আয়্যুহাল্লাযীনা আমানু ইজা লাকীতুম ফী আতান ফাসবুতু ওয়াজ কুরুল্লাহা কাছিরাল্লা য়াল্লাকুম তুফলেহুন। ওয়া আতীয়ুল্লাহু ওয়া রাসুলাহু ওলা তানা জাত্মু ফাতাফসালু ওয়া তাজহাবু রীহুকুম ওয়াছ বেরু। ইন্নাল্লাহা মা-আস সাবেরীন।" (আনফাল : ৪৫-৪৬)

অনুবাদ : হে যাহারা ঈমান এনেছো কোন বাহিনীর সাথে যখন তোমাদের মোকাবিলা হয় তখন দৃঢ় পদে থাক এবং আল্লাহ্কে বেশী করে স্মরণ করো যাতে তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পার। আল্লাহ্ ও তঁদীয় রাসূলের আনুগত্য কর এবং মতানৈক্য করোনা; অন্যথায় তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হবে ও তোমাদের প্রতিপত্তিও লয় পেয়ে যাবে। ধর্য অবলম্বন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্পাক ধর্যাবলম্বনকারীদের সংগে আছেন।

গ. ওহুদ যুদ্ধ প্রসংগ

হিজরী দ্বিতীয় সনের রমজান মাস। বদর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার প্রতিশোধ নেয়ার হিংস্র উন্মত্ততায় কাফেররা মুনাফিক ইহুদীদের উস্কানী ও সহায়তায় ওহুদ যুদ্ধের অবতারণা করে। এই যুদ্ধে রাসূল (দ.) এর যথাযথভাবে আদেশ পালনে শৈথিল্য প্রদর্শনের কারণে মুসলিম বাহিনী দারুনভাবে বিপর্যস্ত হয় বটে তবে পরাজয়ের গ্লানি থেকে পরিত্রাণ পায়। ওহুদের যুদ্ধ মুসলমানদেরকে যুদ্ধশিল্প সম্পর্কে কতিপয় নবতর জ্ঞান ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে। এর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় দিকগুলো হচ্ছে :

১. এই যুদ্ধে চিকিৎসা সেবার দলটি মহিলাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এদের একজন যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়কর পরিস্থিতি অবলোকন করে নিজেই তার নার্সিং দায়িত্ব ত্যাগ করে তরবারী ও বর্ম নিয়ে পুরুষ যোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়ে যান।

২. এই যুদ্ধে এই নীতিও জারী করা হল যে শহীদানদের জন্য তীব্রস্বরে কান্নাকাটি করা যাবে না।

www.pathagar.com

৩. রাসূলে করীম (দ.) এর আদেশ পালনে শৈথিল্য প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর রাসূল (দ.) শৈথিল্য প্রদর্শনকারীদেরকে ভর্ৎসনা করেননি; এবং তাঁর এহেন আচরণের দ্বারা "মানুষের যে ভুল করার প্রবণতা রয়েছে" এর স্বীকৃতি তিনি প্রদর্শন করেছেন। এ প্রসংগে পবিত্র আয়াত ও নাযিল হয়েছে এই গুরুত্ব উপলব্ধ করিয়ে যে তাঁর (রাসূল দ.) এহেন করুনা ও মার্জনা প্রশংসনীয় এবং এহেন মমতা ও দয়া কঠিন বিপর্যয়কালীন সময়ে সৈন্যদের মধ্যে বন্ধন সংরক্ষণে অত্যাবশ্যক।

৪. আল্লাহর রাসূলকে (দ.) আরো আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন তাঁর যোদ্ধাদের সাথে আলোচনা করেন; এবং এভাবে "ইসলামে সলাপরমর্শের" দ্বারা সুহৃদ ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন বিনষ্ট হয় এমন পথ পরিহার করে নিজেদের মধ্যে পারস্পারিক ক্ষমা প্রদর্শন করে আল্লাহ্পাকের নিকট পরস্পরের মঙ্গলের জন্য দোয়া করার পদ্ধতি সম্বলিত নির্দেশ এই সময়টিতে জারী হয়।

৫. পনর বছর থেকে বয়স্কদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগদানের বিধান প্রবর্তন করা হয়।

৬. যোদ্ধাদের সহযোগিতায় মহিলাদের অংশ গ্রহণ অনুমোদন করা হয়।

৭. দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

৮. জনস্বার্থের জন্যে ব্যক্তিস্বার্থ অতিক্রান্ত করে সেনা অভিযান স্বীকৃতি লাভ করে।

১০. শহীদদেরকে বিনা গোছল ও কাফনে কবর দেয়ায় বিধান চালু করা হয়।

১১. সমাধিস্থ করার ক্ষেত্রে একাধিক মৃতদেহ একই কবরে দেয়ার বিধান জারী হয়।

উল্লেখ্য বদর যুদ্ধের পর ২রা হিজরীতে ক্বিবলা বাইতুলমুকাদ্দাস থেকে সরিয়ে মক্কায় কাবা ঘরকে নির্ধারণ করা হয় এবং রাসূলে পাক (দ.) এর এহেন দীর্ঘ বাসনাকে মর্যাদা দিয়েই এই পরিবর্তন ঘটানোর মাধ্যমে ইহুদীদের প্রতাপ ও অহংকারের অবসান ঘটিয়ে ওম্মতে মোহাম্মদীর মর্যাদা ও প্রতিপত্তির পত্তন ঘটে। এই বছরেই সিয়াম পালনের আদেশ জারী হয় এবং শরীয়াহ সংক্রান্ত অনেক আয়াত নাযিল হয়।

www.pathagar.com

ঘ. বনুকাইনুকার বিরুদ্ধে অভিযান [২য় হিজরী, ৬২৪ খ্রি.]

উল্লেখ্য ইহুদীদের বনুকাইনুকা নামক এক গোত্রের বিরুদ্ধে বদর যুদ্ধের পর আল্লাহর রাসূল অভিযান চালান। এর কারণ :

একদিন এক ইয়াহুদী একজন মুসলিম মহিলার শালীনতার হানি করে। ফলে মহিলার স্বামী এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ঐ ইয়াহুদীকে হত্যা করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইয়াহুদী সম্প্রদায় মদীনা চুক্তি ভংগ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একতরফা যুদ্ধ ঘোষণা করায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

মুসলমানদের নিকট ১৫ দিন পর্যন্ত ইয়াহুদীদের দূর্গ অবরোধ থাকার পর ইয়াহুদীরা আত্মসমর্পন করে, এবং মদীনা ছেড়ে চলে যাবে এই শর্তে মুক্তি পেয়ে সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করে।

দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে এই ঘটনাটি ঘটে।

ঙ. বানু নাজীরের যুদ্ধ [৩য় হিজরী, ৬২৫ খ্রি.]

ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যস্ত অবস্থা অবলোকনে ইহুদীরা দারুণ খুশী হয়। তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত বানু নাজীর গোত্রের লোকদের ইসলামের প্রতি ঈমান কর্পূরের ন্যায় উবে যায়। এরা কাব ইবনে আল আশরাফের প্ররোচনায় ৪০ জন দোসরকে নিয়ে মক্কায় উপস্থিত হয় এবং আবু সুফিয়ানের সাথে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

রাসূল (দ.) কাব ও আবু সুফিয়ানের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাদেরকে আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত অবরোধ করে রাখেন। পরে তারা চুক্তিবদ্ধ হলে পরাভূত আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাই-এর প্ররোচনায় এরা দু'বার চুক্তি ভংগ করে। এতে মুসলমানদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হয়। ফলে এই পটভূমিতে নিম্ন কতিপয় নির্দেশ জারী হয় :

১. ভীতির জন্যে সালাত আদায়ের আদশ
২. খামর বা নেশা পানীয় নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার আদেশ
৩. প্রয়োজনে শত্রুর ফল-বৃক্ষরাজি ধ্বংস করার অনুমতি দান।

চ. বানু কুরাইজার যুদ্ধ [৫ম হিজরী ৬২৭ খ্রি.]

বানু কুরাইজা ইহুদী সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠী। এরা মদীনায় বসবাস করত। এদের বিশ্বাসঘাতকতায় ও কোরেশদের সাথে গোপন আঁতাতের কার্যকলাপে

www.pathagar.com

অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর রাসূল (দ.) এদেরকে শায়েস্তা করার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। **এটিই প্রসিদ্ধ আহযাবের যুদ্ধ**। এই যুদ্ধের সময়ই সেনাবাহিনী অভিযান ত্বরান্বিত করার জন্যে রাসূল (সা.) বানুকোরায়জার নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত আসরের নামাজ আদায় করতে নিষেধ করেন। এতে তাঁর (দ.) অনুসারীদের কেহ কেহ এর শাব্দিক অর্থানুযায়ী সেখানে না পৌছা পর্যন্ত আসর এর সালাত আদায়ে অসম্মতি জানান। অবশিষ্ট জনেরা ত্বরিত যাওয়ার লক্ষ্যে এ আদেশ প্রদান করা হয়েছে মনে করেছেন, আসর এর সালাত তাই তাঁরা ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করেন। আল্লাহর রাসূল (দ.) এদের কাউকেই এজন্যে দোষী সাব্যস্ত করেননি। এ ঘটনা অর্থাৎ আহযাবের যুদ্ধ থেকে নিম্ন নীতিমালা বিরচিত হয় :

১. বিলম্বে সালাত আদায়ের (আসর মাগরেবের সালাত এক সঙ্গে আদায়) আইনানুগ ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।
২. মারাত্মক অসুস্থতা বা আঘাত প্রাপ্ত অবস্থায় ইসারা ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে সালাত আদায়ের পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।
৩. পালক সন্তানের সাথে বিবাহ সংক্রান্ত নীতিমালার বিধান (হযরত জায়েদ কর্তৃক তালাক প্রাপ্তা হযরত জয়নব (রা.) এর সাথে রাসূল (দ.) এর বিবাহের ঘটনা) প্রবর্তিত হয়।
৪. বাড়িঘরে দেখা সাক্ষাতের সময় অনুমতি গ্রহণ ও মেহমান হিসাবে অবস্থানের বিধানসমূহের নীতিমালা প্রতিষ্ঠা হয়।

ছ. বানু মোস্তালিকের যুদ্ধ [৫ম হিজরী ৬২৭ খ্রি.]

বানু মোস্তালিকও ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত একটি গোষ্ঠী। এরাও রাসূল (দ.) এর বিরুদ্ধে আক্রমণের পায়ঁতারা করছিল। এই সময়েই হযরত আয়েশা (রা.) এর পূতপবিত্র চরিত্রের উপর মিথ্যা অপবাদ রটানো হয়েছিল। এই যুদ্ধাভিযান পরিচালনা শেষে রাসূলের (দ.) প্রত্যাবর্তনের সময় বিবি আয়েশা তাঁর গলার নেকলেস খুঁজতে গিয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যথা সময়ে মদিনায় ফিরে আসতে ব্যর্থ হন। তিনি হাওদায় আছেন মনে করে সেনাদল তাঁকে ফেলে চলে আসে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইহুদীরা অপবাদ রটনায় চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে এবং নবীপরিবার ও সাধারণ মুসলমানদের মনে দারুন বিষাদ ও উদ্বিগ্নের ছায়াপাত ঘটায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক কতিপয় কঠোর নির্দেশ জারী করেন। সেগুলো হচ্ছে সংক্ষেপে এই :

www.pathagar.com

১. ব্যভিচারের জন্য শাস্তি বিধান
২. মহিলাদের মর্যাদা বিনষ্ট করার জন্য শাস্তির বিধান
৩. মন্দ সংবাদ গ্রহণ ও এর মোকাবেলার নীতিমালা আরোপন
৪. ব্যভিচারের অপরাধ সনাক্তকরণে চারজন সাক্ষীর আইনগত স্বচ্ছতার বিধান
৫. মুলাননাহ্ (Mulannah) বিষয়ক বিধান প্রবর্তন :
   ক. স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ আনায়নকারী স্বামীকে আর কোন সাক্ষী নেই বলে ৪ বার এই কসম কাটতে হবে যে সে তার স্ত্রীকে কুকাজে লিপ্ত থাকতে দেখেছে। আর যদি সে মিথ্যা বলে তবে ৫ম বারে নিজেই নিজেকে অভিসম্পাত করবে।
   খ. স্ত্রীকেও নিজের পবিত্রতার সাক্ষ্য দিতে হবে অনুরূপ ভাবে।
   গ. উক্ত উভয় ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত স্বামী-স্ত্রীর চিরজন্মের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে।
৬. ব্যক্তিগত আক্রোশে অপবাদ রটনা করায় হযরত আবু বকর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে দান-খয়রাত প্রদান প্রত্যাহার করায় পাক কালামে তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করা হয়। অর্থাৎ ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে দান খয়রাত প্রত্যাহার করা যাবে না বলে ঘোষণা প্রদান করা হয়।

জ. খায়বার যুদ্ধ [৭ম হিজরী, ৬২৮ খ্রি.]

খায়বার অঞ্চলের ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে রাসূলে পাক (দ.) তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এই সাফল্যের পথ বেয়ে একদিকে আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলমানেরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং অপর দিকে খায়বার বিজয়ের সোনালী লগ্নে নিম্ন বিধানসমূহ জারী হয় ;

১. গাঁধার মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়।
২. মাংসভোজী প্রাণী খাওয়াও নিষিদ্ধ করা হয়।
৩. পুঁজি ও শ্রমের সরবরাহকারীদের অংশীদারিত্বের অনুমিত প্রদান করা হয়।
৪. গর্ভবতী বন্দীনীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়।
৫. শত্রু হোক বা মিত্র হোক উভয় ক্ষেত্রেই পারস্পারিক সততা বজায় রাখাটা নীতি হিসাবে গৃহীত হয়।

www.pathagar.com

৬. ক্বাজা সালাত আদায়ের অনুমোদন হয়।
৭. 'মুতা' বা অস্থায়ী বিয়ে নিষিদ্ধ হয়।

স্মর্তব্য, খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী সপ্তম সনে, মুহাররম মাসে। এতে ৯৩ জন ইহুদী নিহত হয়। মুসলমানদের মধ্যে শাহাদাত বরণ করেন ১৫ জন মাত্র। খায়বারে ছিল ৬টি দুর্গ। একটি দুর্গ ২০ হাজার ইয়াহুদী যোদ্ধার দখলে ছিল। মাত্র ১৬ শত যোদ্ধা নিয়ে রাসূল (দ.) দুর্গগুলো অবরোধ করে রাখেন মাঝে মাঝে খন্ড যুদ্ধের মোকাবেলা করে। ২০ দিনের যুদ্ধ শেষে খায়বার মুসলমানদের দখলে আসে। এখানকার জমিতে চাষাবাদ করে এর অর্ধেক ফসল মুসলমানদেরকে প্রদান করার শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এরা প্রাণ রক্ষার সুযোগ ভোগ করে। যুদ্ধবন্দীদের শিক্ষকতায় নিয়োগ দানের কতিপয় দৃষ্টান্ত এ প্রসংগে সবিশেষভাবে উল্লেখ্য। গণীমত বা যুদ্ধবন্দি প্রসংগে আল্লাহ্পাক রাসূলে করিম (দ.) কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেন। সুরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে :যাহা গণীমত প্রসংগ' শীর্ষকে নিম্নে বিশদ ব্যাখ্যা করা হলো।

ঝ. গণীমত প্রসংগ

এটি একটি ইসলামী পরিভাষা। এ প্রসংগে আল্লাহ্ এরশাদ করেন : "আর একথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্ত-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গণীমত হিসাবে পাবে এর এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য, যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহ্র উপর এবং সে-বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যে দিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।" [৮ : ৪১]

আভিধানিক অর্থে গণীমত হচ্ছে ঐসমস্ত মাল-সম্পদ যা শত্রুর নিকট থেকে পাওয়া যায়। শরীয়তের পরিভাষায় যুদ্ধ বিগ্রহে বিজয়ার্জনের মাধ্যমে যে মালামাল অর্জিত হয় তাকেই বলা হয় গণীমত। (তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন' পৃঃ ৫৩৪ দ্র :) লক্ষনীয়, সন্ধি-সম্মতির মাধ্যমে কাফের ও অমুসলিমদের থেকে যা আদায় হয় যেমন জিযিয়া কর, খাজনা, টোল, ইত্যাদিকে ইসলামী পরিভাষায় "ফাই" বলা হয়। ফাই-ও শরীয়ত অনুযায়ী উপভোগ্য।

www.pathagar.com

পরিশেষে এটা দিবাকরের মত ভাস্বর যে ইসলামের যুদ্ধ ও সন্ধি বিশ্বশান্তির মৌলিক পথ-নির্দেশক। অর্থাৎ :

১. মানুষ স্বাভাবিক ভাবে কোন কিছুরই মালিকানা লাভ করতে পারেনা যদি না তা আল্লাহ্ তায়ালার স্বীয় আইনের মাধ্যমে তাকে মালিকানা সাব্যস্ত করে দেয়া হয়।

২. খোদাদ্রোহীদের অবনত ও অনুগত রাখার জন্য আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা প্রাপ্ত শত্রুপক্ষের ধনসম্পদ মুসলমানদের জন্য আল্লাহর সংশ্লিষ্ট আইন মান্যকরনে সিদ্ধ হয়।

উক্ত দুটি নিয়ন্ত্রণের কারণে গণীমত হিসেবে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ইসলামের আচরণ স্বর্গীয় বিভা ও মর্যাদায় চির ভাস্বর হয়ে রয়েছে। দৃষ্টান্ত : বদরের যুদ্ধের সংশ্লিষ্ট ঘটনা।

১. ৭০ জন বন্দীকে উষ্ট্রপিঠে আরোহণ করিয়ে মদীনায় নিয়ে যাওয়া

২. শিক্ষিত যুদ্ধ বন্দীদেরকে শিক্ষা দানের বিনিময়ে মুক্তিদানের মাধ্যমে মর্যাদা প্রদান

৩. নবী চরিতের উপর অশালীন ও কুবক্তব্য প্রদানকারী যুদ্ধবন্দী সুহাইল বিন আমরকে হযরত ওমর (রা) এর যথার্থ প্রস্তাব অনুযায়ী উক্ত জঘন্য অপরাধের শাস্তি হিসেবে তার সামনের পাটির দুটি দাঁত উপড়ে ফেলানোর প্রস্তাব বিশ্ব মানবতার নবী (দ.) এর অনুমোদন না করা

৪. রাত্রি বেলায় বন্দিদের বন্ধনের কষ্টে গোঙাঁনী করার আওয়াজ শ্রবণে সব বন্দীর বাঁধন ঢিলে করে দেয়ার জন্য নবী (দ.) এর নির্দেশ প্রদান

ইত্যাদি নিঃসন্দেহে সর্বোতভাবে এই প্রমাণ করে যে ইসলামের যুদ্ধ ও এর মানবিক দিক কতই না কল্যাণ প্রসূত এবং কতই না অনুপম ও স্বর্গীয় গোটা বিশ্বমানবের তরে!

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ইসলাম ও আনবিক যুদ্ধ

রাসূলে পাক (দ.) ও সাহাবীদের আমলে ইসলামের যুদ্ধ তথা জ্বিহাদে অভিব্যক্ত মানবিক ও ন্যায়পরায়ণতার দর্শন-ইতিহাস ও বাস্তবতা বিধৃত ইসলামী রাষ্ট্রের কল্যাণকর সেবা ও সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে সেসময়কার অনেক পড়শী অমুসলিম রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শ ও দর্শনের প্রতি পরোক্ষভাবে হলেও গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করত। কারণ, তাদের এই দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, আর যা' হোক পড়শী ইসলামী রাষ্ট্র মজলুম এবং দুর্বল রাষ্ট্র বা জালিম রাষ্ট্রের মজলুম জনতারও ভ্রাতা হিসাবে কাজ করে। মুসলিম বীর সেনানী তারেকের স্পেন বিজয়, মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়-ইত্যাদি বিজয় এর কতিপয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি ও রণকৌশল নীতি নৈতিকতায় বিধৃত ও কঠোর ধর্মীয় বিধান তথা ইবাদত জ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হওয়ায় তা মৌলিকভাবে অপরাজয়ে শক্তি হিসাব মূর্ত। Balance of Terror ভীতির ভারসাম্য প্রশমিত করে Balance of Peace 'শান্তির সমতা' সংরক্ষণে এর সেনাবাহিনীর ভূমিকা তদানীন্তন আন্তর্জাতিক বিশ্বাঙ্গনে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেছিল; ৮ম শতাব্দীতে অত্যাচারী বিশাল রোমসাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্যের স্বৈরাচার ও ঔদ্ধত্যের অবসান ঘটিয়েছিলো, পরবর্তিতে ক্রুসেড যুদ্ধে উন্মত্ত মধ্যযুগীয় বর্বর য়্যুরোপকে শিক্ষা-শান্তির সবক দিয়েছিল, তদানীন্তন পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশকেও অশিক্ষা-কুশিক্ষার বেড়াজাল থেকে মুক্তি দান করেছিল অত্যাচারী ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পৌরহিত্যের নিষ্ঠুরতা থেকে । প্রকৃতপক্ষে ইসলামের যুদ্ধ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী একদিকে যেরূপ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অস্ত্র প্রতিযোগিতার প্রবণতা হ্রাসের চমৎকার সহায়ক, অন্যদিকে ইহা মানুষের হৃদয়ে উন্নততর ও মহান সুকুমার বৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত

www.pathagar.com

বিকাশেরও পরম পথ-নির্দেশক। ইসলামে যুদ্ধ-দর্শন ন্যায় ও সত্য সংরক্ষণের ধর্মীয় নির্দেশ হওয়ায় মুসলমানদের জন্য এহেন জ্বিহাদ বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে একটি অনন্য ইবাদতও।)

বর্তমান আনবিক অস্ত্রসমৃদ্ধ একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বের প্রতি নেত্রপাত করলে এটা দিবালোকের মতো ফুটে ওঠে যে, আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ কি ইসলামী, মুসলিম বা অমুসলিম রাষ্ট্র নির্বিশেষে ইসলামের যুদ্ধ সম্পর্কিত মহান শিক্ষা ও আদর্শ হতে বিচ্যুত হওয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বড় রাষ্ট্র তথা পরাশক্তিগুলো সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনেশিবাদের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উত্তরোত্তর আনবিক শক্তি অর্জনের প্রতিযোগিতায় প্রতিনিয়ত ব্যস্ত-সমস্ত। এই অবস্থায় মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর কি করণীয়-এটা সত্যি একটি বিরাট দুশ্চিন্তার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(ইসলাম আত্মমর্যাদা ও আত্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধের নির্দেশ ও বিধান দিয়েছে। এই দৃষ্টিতে অমুসলিম পরাশক্তির হামলা ও আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহেরও অনুরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ নৈতিক, মানবকি ও ধর্মীয় তথা সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপরিহার্য। স্বীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, জনগণের ধন-প্রাণ-সম্পদের হেফাজত ও নিরাপত্তার জন্যেই শুধু নয়, বরং আগ্রাসন থেকে অন্য কোন মুসলিম বা অমুসলিম দুর্বল রাষ্ট্রের হেফাজতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রকে সামরিক শক্তি ও রণসজ্জায় যথাযথভাবে প্রস্তুত রাখা অত্যাবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে আনবিক রণসজ্জা থেকে প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত রাখা ও নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষেত্রেও মুসলিম রাষ্ট্রের শক্তি ও সহায়তায় তাত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক যোগাযোগ প্রচারাভিযান জোরদার করা অত্যাবশ্যক। কারণ মানবকুল ও গোটা বিশ্বসৃষ্টির আমানতদারী আল্লাহপাক তাঁর মনোনীত খলিফা হিসাবে মুসলমানদের উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। এই দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে মুসলমাদেরকে দিয়ে তা পালন করানোর আবশ্যিক কর্তব্য ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের।) পাক কুরআনের সংশ্লিষ্ট ঘোষণা অনুযায়ী এই পৃথিবী নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানুষের সময়োপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অপর একটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দু-প্রকার চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না :

১. যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রুপাত করেছে
২. যে চোখ রাত জেগে আল্লাহর পথে (সার্বভৌমত্ব সীমান্ত রক্ষায়ও যুদ্ধ ময়দানে) পাহারারত ছিলো।

www.pathagar.com

এতদসংগে ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর বৈশিষ্ট্যও বিচার্য। এঁরা ঋষি-দরবেশ চরিত্রের মতোই দেহ-মনে দৃঢ় ও পবিত্র। এহেন চরিত্র ও দৃঢ়তা গঠনের নিমিত্তে তাদের প্রতি আরোপিত কতিপয় নির্দেশ লক্ষ্যণীয় :

১. ইসলামের যুদ্ধ-নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে রণকৌশল গ্রহণ ও প্রয়োগ করা।
২. জৈবিক ও যৌনক্ষুধা মিটানোর জন্যে ব্যভিচারের নিকটবর্তী না-হওয়া।
৩. যেহেতু সৈনিক এই সুবাদে অঢেল খাদ্যসামগ্রী ও ভোগের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ হতে নিবৃত্ত রাখা।

সৈনিকদের পারিবারিক জীবন যাতে মানসিক যাতনার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, সেজন্যে হযরত ওমর (রা.) এর শাসনামলের সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনাও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একদিন জনৈক মুজাহিদের স্ত্রীর মর্মস্পর্শী বিরহের গান হযরত ওমর (রা.) শুনতে পেয়ে অনিতবিলম্বে তিনি সৈনিকদের জন্য ছুটি ও অবকাশ প্রদানের বিধান চালু করেন। তখন থেকে নৈতিকতা সংরক্ষণের জন্য ছুটি ও অবকাশ প্রদানের বিধান সামরিক বাহিনীতে চালু করেন তিনি। নৈতিকতা সংরক্ষণের জন্য সুন্দরী ও আকর্ষণীয় যুবাদের হেফাজতের ব্যবস্থা নেন। এই লক্ষ্যে তিনি কোন কবিতায় নারীপ্রেম গাঁথাকেও জঘন্য অপরাধ ঘোষণা করে এহেন কাব্যচর্চার জন্য দোররা (বেত্রাঘাতে) মারার শাস্তিও জারী করেন। এসব বর্ণনা থেকে এটা দেদীপ্যমান যে ইসলামে যুদ্ধের শালীনতা, মর্যাদা, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের জন্য 'সৈনিকদিগকে' সতর্কতার সাথে প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধ-ময়দানে পাঠানো হতো। এ ধরণের সৈনিক বিজয়ী বেশে যেদেশেই প্রবেশ করত; সেই দেশ ভীতি ও শংকা অপেক্ষা 'রহমত' ও নিরাপত্তায় এমন নিশ্চয়তা অনুভব করত যেমনটি শিশু তার মায়ের কোলে অনুভব করে থাকে। ইতিহাসে দেখা যায় সুলতান সালাহ্ উদ্দীন ও রাজা রিচার্ডের ঘটনা, মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু বিজয়ের পর এই দেশের জনগণ দেবতাতুল্য সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি তাদের সৈনিকচরিত্রের অনুপম ব্যক্তিত্ব ও আচরণ প্রকাশের জন্যে-ই হয়েছে। ঠিক এই দৃষ্টিতে আনবিক শক্তির ন্যায়পর সংরক্ষণ ও প্রয়োগের অধিকারী যে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রই, তা ইতিহাস সিদ্ধ এবং কল্যাণকর দৃষ্টিতে অমোঘ সত্য ও বাস্তবসম্মত নয় কি?

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
পরিশিষ্ট

[এই অংশে বর্তমান সভ্যদেশগুলোর (?) যুদ্ধ ও বন্দীদের প্রতি দৃষ্টিভংগী ও কার্যকারণ বিধির উন্মোচনোপলক্ষে পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী থেকে সংগৃহীত কতিপয় উদ্ধৃতির উল্লেখ করা হয়েছে যা' পাঠে বিদগ্ধ পাঠক সমাজ মৌলিকভাবে আধুনিক বিশ্বের 'যুদ্ধ'-এর প্রেক্ষাপটে মানবিক আইন প্রতিপালনে ইয়াহুদী ও মার্কিনীদের স্বৈরাচারী দাপট ও হৃদয়হীন ক্ষমতার অপব্যবহার হৃদয়ংগমে দারুণভাবে উপলব্ধ হবেন-গ্রন্থকার ।]

ক. যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী সামরিক আগ্রাসন ও নৃশংসতার চিত্র

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি। বিশ্বব্যাপী চলছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আগ্রাসন ও নৃশংসতা। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, বিগত ৫০ বছরে এই যুদ্ধবাজ দেশটি ১১৩টি দেশে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে। বিশ্বের মধ্যে খুব কম দেশই আছে যেখানে কোন না কোন ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ঘটেনি। নিচে যুক্তরাষ্টের সামরিক আগ্রাসন ও নৃশংসতার কিছু চিত্র তুলে ধরা হল।

১৯৪০ ও ১৯৫০-এর ফিলিপাইন : ১৯৪০-এর দশকে ফিলিপাইনে তেইশটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি গড়া হয়। ১৯৫০ এর দশকে পঞ্চাশ হাজার ফিলিপিন সৈন্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং ২০ কোটি ডলারের অস্ত্র সরবরাহ করা হয়। এভাবে যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইনের ওপর তার আধিপত্য কায়েম করে।

আগস্ট, ১৯৪৫-এ জাপান : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নির্দেশে ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ই আগস্ট হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এ পারমাণবিক হামলায় হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর দুটি ধূলিসাৎ হয়ে যায় এবং অগণিত লোক মৃত্যু বরণ করে।

www.pathagar.com

১৯৪৭-১৯৫০-এ গ্রিস : গ্রিসকে যুক্তরাষ্ট্র কার্যত তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করে।

১৯৪৮-১৯৫৬-এর পূর্ব ইউরোপ : অপারেশন স্পিলটার ফ্যাক্টর-এর মাধ্যমে চেকোশ্লোভাকিয়ার ১,৬৯,০০০ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যকে গ্রেফতার করানো হয়, হাঙ্গেরী, পূর্বজার্মানি, বুলগেরিয়া ও পোল্যান্ডে কয়েক হাজার মানুষকে গ্রেফতার ও হত্যা করা হয়।

১৯৪৯-১৯৫৩-এ আলবেনিয়া : যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্ত আক্রমণে কয়েকশ' আলবেনীয় মারা যায় এবং বহু মানুষ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়।

১৯৫০-এর দশক-এ জার্মানি : রাশিয়ায় আগ্রাসনের অজুহাতে পশ্চিম জার্মানিতে সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলা হয় এবং সেনা মোতায়েন করা হয়।

১৯৫৩-এ ইরান : ইরানের একমাত্র বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত তেল কোম্পানি "আংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানি" জাতীয়করণ করায় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোসাদ্দেককে সরিয়ে দিয়ে শাহকে ক্ষমতায় বসানো হয়।

১৯৫৩-১৯৫৪-এ গুয়েতেমালা : যুক্তরাষ্ট্র জ্যাকেবো আরেঞ্জ-এর নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে দিয়ে সামরিক দলকে ক্ষমতায় বসায়।

১৯৫৫-এর মাঝামাঝিতে কোস্টারিকা : প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী ছিলেন কোস্টারিকার প্রেসিডেন্ট জোফে ফিগুয়ার্স। পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতে পরিণত হন। ১৯৫৫ সালের দিকে নিকারাগুয়ার একনায়ক সোমোজাকে ব্যবহার করা হয় ফিগুয়ার্সের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে।

১৯৫৬-১৯৫৭-তে সিরিয়া : সি.আই.এ. সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিপুল অর্থ দিয়ে সিরিয়ার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

১৯৫৭-১৯৫৮-এর মধ্যপ্রাচ্য : ১৯৫৭ সালের ৯ই মার্চ কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ারের মধ্যপ্রাচ্য নীতি অনুমোদিত হয়। ইসরাইলি মধ্যপ্রাচ্য নীতি অনুমোদিত হয় এবং ইসরাইলি বাহিনী মিসরে প্রবেশ করে সিনাই উপদ্বীপ দখল করে। ১৯৫৭-১৯৫৮ সালে ৮টি ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনায় সিরিয়া ও মিসরের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। মিসরের রাজা ফারুককে নির্বাসনে পাঠানো হয় এবং লেবাননে মোতায়েন করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের ১৪,০০০ নৌ ও স্থল সেনা।

১৯৫৭-১৯৫৮-এর ইন্দোনেশিয়া : ১৯৫৫ সালের দিকে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে হঠাতে সি.আই. এ. গোপন সামরিক কার্যকলাপ এবং প্রশিক্ষণ শুরু করে। ১৯৫৭'র নভেম্বর মাসে সামরিক বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৯৫৮ সালের জুন মাসের মধ্যে সুকর্ণ'র বাহিনী সিআইএ সমর্থিত বিদ্রোহীদের দমন করে।

www.pathagar.com

১৯৫৩-১৯৬৪-এ ব্রিটিশ গায়ানা : সি. আই. এর আন্তর্জাতিক শ্রমিক মাফিয়া সংগঠন বৃটিশ গায়ানাতে একটি ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠন করে। এর মাধ্যমে ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে ছেদি জগান সরকারকে উৎখাত করে।

১৯৫০-১৯৭৩ সালে ভিয়েতনামে : সামরিক আগ্রাসন শুরু করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নৃশংসতায় ২৫ থেকে ৩০ লাখ ভিয়েতনামী মৃত্যুবরণ করে।

১৯৫৫-১৯৭৩-এ লাওস : মোর্চা সরকারের শরিত "প্যাথেট লাও" নামক সংগঠনের সাথে স্থল যুদ্ধে পেরে না উঠলে যুক্তরাষ্ট্র আকাশ পথে লাওস আক্রমণ করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে।

১৯৫৯-এ হাইতি : হাইতির বিদ্রোহীদের দমন করতে সরকারি সেনাবাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে আক্রমণ হানে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা বাহিনী।

১৯৬০-১৯৬৪-তে কঙ্গো : সিআই এর আর্থিক ও সামরিক সাহায্য নিয়ে জোসেফ মুবুতুর বাহিনী প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিস লুমুম্বাকে বন্দি করে জেলখানায় হত্যা করে।

১৯৬০-১৯৬৬-এ ডোমিনিকান রিপাবলিক : যুক্তরাষ্ট্র বিমান ও নৌবাহিনী বিপ্লব দমন করে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত ডোমিনিকান রিপাবলিকান তার দখলে রাখে।

১৯৬৪-১৯৭৩-এ চিলি : প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দে বিনা ক্ষতিপুরণে যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন চিলির মাইনিং কোম্পানি জাতীয়করণ করেন।

১৯৫৯-১৯৮০ সালে কিউবা : ১৯৫৯-এর জানুয়ারিতে কিউবা বিপ্লবের পর যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কিউবার সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং যুক্তরাষ্ট্র কিউবাতে রাসয়নিক ও জৈবিক অস্ত্র প্রয়োগ করে। ফলে কিউবাতে বিভিন্ন রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু মানুষ, পশুপাখি মারা যায় ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

খ. মানবিক আইনের প্রেক্ষাপট ও আন্তর্জাতিক আইন

মানবিক আইন (Humanitarian Law) হল আন্তর্জাতিক আইনের সেই অংশ যা মানবতার প্রতি অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং যুদ্ধের সময় ব্যক্তি বিশেষকে রক্ষণাবেক্ষণ লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত। মানিবক আইনের জনক Jean Picted সর্বপ্রথম মানবিক আইন শব্দটি ব্যবহার করেন। মানবিক আইনের এই ধারণা নূতন নূতন বাস্তবতায় আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি প্রয়োগ করেন। মানবিক আইনের দুটো প্রধান শাখা রয়েছে যথা–**প্রথমত জেনেভা আইন** এবং **দ্বিতীয়ত হেগ আইন**। মুলত. জেনেভা আইন যুদ্ধস্থানে অবস্থানরত কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণ

www.pathagar.com

করেনি এমন সাধারণ লোকজনের অধিকার ও দায়দায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং অপরদিকে হেগ আইন যুদ্ধে নিয়োজিত ব্যক্তিদের যুদ্ধকালে তাদের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানে সচেষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন কিছু নিয়মের সমষ্টি যেখানে যুদ্ধের সময় যুদ্ধাহত সাধারণ মানুষ ও আহত সৈনিকদের ন্যূনতম অধিকারের কথা বলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন অবশ্য যুদ্ধ আইন নামে পরিচিত। মূলত. মানিবক আইন আন্তর্জাতিক আইনেরই একটি অংশ। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন প্রয়োগ হয় শুধু যুদ্ধের সময়। আন্তর্জাতিক মানবিক আইন প্রাচীন সভ্যতা এবং ধর্ম থেকে সৃষ্টি হলেও বিধিবদ্ধ ও সার্বজনিনভাবে স্বীকৃতি পায় উনিশ শতকে। সত্যিকার অর্থে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের একটা বৃহৎ অংশ সংরক্ষিত রয়েছে ১৯৪৯ সালের চারটি কনভেনশনের মধ্যে। এছাড়াও ১৯৭৭ সালে জেনেভা কনভেনশনের পরিপূরক স্বরূপ দুটি অতিরিক্ত প্রটোকোল গ্রহণ করা হয়, যা পরবর্তী পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আরো বেশ কিছু চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সৈনিকদের জন্য। কিছু সুনির্দিষ্ট অস্ত্র ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞাসহ বেশকিছু সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর জনসাধারণ ও মালামাল রক্ষার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, যা কি-না আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে মাইলস্টোন হিসেবে বিবেচিত। যার মধ্যে রয়েছে ১৯৫৪ সালের Conventoin for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict এবং এর দুটি প্রটোকোল. ১৯৭২ সালের Biological Weapons Convention, ১৯৮০ সালের Conventional Weapons Convention; এবং এর তিনটি প্রটোকোল, ১৯৯৩ সালের Chemical Weapons Convention, ১৯৯৭ সালের Ottawa Convention on Anti Personal Mine এবং সর্বশেষ ২০০০ সালের Optional Protocol to the Convention on the Rights of Child on the Involvement of Children in Armed Conflict.

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের বহু অংশ এখন Customary Law (প্রথাগত আইন) হিসেবে স্বীকৃত। কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ও সমস্যা নিরূপণে এই আইন কখনই মাথা ঘামায় না। মূলত যে বিষয়ে এ আইন সচেতন তা হল সব বেসামরিক মানুষ যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তাদের রক্ষা করা।

www.pathagar.com

গ. প্রাচীন কাল, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক যুগের মানবিক আইন প্রসংগ : প্রাচীনকালে মিশরীয় সভ্যতার সময় মানবিক আইনের উন্নয়ন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সে সময়ে মিশরীয়দের মধে Seven Words for True Mercy বিদ্যমান ছিল এবং তারা যুদ্ধের সময় এ জাতীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলত। যেমন- তৃষ্ণার্তকে পানি পান করানো, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান. আশ্রয়হীনকে আশ্রয়দান. বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, বন্দিদের মুক্তি দান, অসুস্থকে সেবা প্রদান করা এবং মৃত ব্যক্তির সৎকারের ব্যবস্থা করা। এছাড়াও প্রচীনকালে বাংলাদেশসহ প্রাচীন ভারত উপমহাদশে আন্তর্জাতিক আইনের চর্চা বিদ্যমান ছিল। মনুসংহিতাসহ অন্যান্য গ্রন্থ্ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানবিক আইনের ধারণা পাওয়া যায়। যেমন যুদ্ধ সংক্রান্ত অস্ত্র সম্পর্কে বলা ছিল অত্যধিক ক্ষতিকারক অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ. কারণ অত্যাধিক ক্ষতিকারক অস্ত্র সৈনিক এবং সাধারণ মানুষ উভয়কে ধ্বংস করে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কার্যাবলী যেমন বিশ্বাস ঘাতকতা, স্থলবোমা. গোপন ফাঁদ এবং রাতের বেলায় ঘুমন্ত সাধারণ নাগরিকের উপর আক্রমণ করা যাবে না।

প্রাচীনকালের ধারণাগুলো আরো শক্তিশালী আকারে প্রকাশ পায় মধ্যযুগে। এ সময় বিভিন্ন ধর্মে মানিবক আইন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। খ্রিস্ট ধর্মের মানবিক আইন সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা যায়। সব মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি এবং একই স্রষ্টার সন্তান। এছাড়া সব ধর্ম মতে সব মানুষই একটি শাশ্বত ও সুন্দর জীবনযাপনের অধিকারী। অন্য ধর্মে যেমনটা বলা ছিল যুদ্ধ করতে হবে ঘোষণা প্রদানের মধ্যে দিয়ে এবং বিবদমান দুই পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে পতাকা উত্তোলন থাকবে। এই সময়ে ইসলাম ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনেরও ব্যাপক উন্নয়ন হয় পরবর্তী সময়টিতে। ইসলাম যুদ্ধবন্দিদের অবস্থান এবং তাদের সেবাযত্ন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরিফের ৮ নং সূরার ৬৭-৬৮ নং আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন যুদ্ধের সময় বেসামরিক জনগণকে কোনক্রমেই হত্য করা যাবে না। হাদীস শরীফে স্বচ্ছভাবে উল্লেখ করা আছে : -Go to war in the name of God and follow His path, fight the infidels, but do not deceive, do not betnay, do not mutilate and do not kill any children.

www.pathagar.com

ঘ. আধুনিক যুগে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ক্রমবিকাশ : প্রসংগ-কথা

আধুনিক অস্ত্র ও তার ব্যবহারে সঠিক যুদ্ধ ধারণার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দিতে বৈজ্ঞানিক চেতানা উম্মেষের ফলে মানবিক আইন রচিত হয় এবং এতে ফ্রেডারিক এবং বেঞ্জামিন ফ্রাংলিন 'Treaty of Friendship and Peace' স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিতে বলা হয় সামরিক আক্রমণের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে হবে।

উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি মানবিক আইনের লংঘন ব্যাপকভাবে হতে থাকে। যেমন, ১৮৪৮ সালে পরাজিত সৈনিককে ব্যান্ডেজ করার দায়ে জনৈক নার্সকে ১ বছরের জন্য কারাদণ্ড দেয়া হয়। .....।

[সৌজন্য : মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সরকার সাগর, আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী।]

ঙ. প্রসংগ : জুইশ কমউনিটি ও আমেরিকার ইসরেল প্রীতি ও ভীতি

বরাবরের মত (মিডল ইস্ট বা মধ্যপ্রাচ্য উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ইসরেলের শক্তি প্রয়োগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে) সৈন্য অপহরণের খোড়া অজুহাত দেখিয়ে ইসরেল যে ভাবে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে তাতে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই হতবাক হয়ে পড়ছে। একটি দেশের মন্ত্রী ও এমপিদের অপহরণ, বোমা মেরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অফিস ক্ষতিগ্রস্ত করা থেকে শুরু করে আরেক দেশের এয়ারপোর্টে হামলা, সাধারণ নাগরিক বিশেষ করে নারী ও শিশু হত্যাসহ অবলীলায় ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরেল। সম্প্রতি প্যালেস্টাইন ও লেবাননে তারা যে হামলা চালাচ্ছে তা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। কৃশ্চিয়ান, ইহুদি ও মুসলমান তিনটি ধর্মের পবিত্র স্থান হিসেবে খ্যাত অঞ্চলটিতে ইসরেলের এই অপবিত্র কাজ দিনের পর দিন পৃথিবীকে কলুষিত করে তুলেছে।

ইসরেলের একজন সৈন্য অপহরণ কিংবা বর্ডারে হামাসের হামলা নিয়ে আমেরিকা যতোটা চিৎকার করে তার পাশাপাশি ইসরেলিদের এই বর্বর হামলায় তাদের কোন প্রতিক্রিয়া থাকে না। বরং তারা বলে হামাসের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। কেউ কেউ এর মৃদু প্রতিবাদ করলেও তা কতোটা আন্তরিক সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। মুসলমান অধ্যুষিত মিডল ইস্টে ছোট একটি রাষ্ট্র হলেও ইসরেলকে স্পর্শ করতে পারে না কেউ। ইসরেল প্রতিষ্ঠার সময় ১৯৪৮

www.pathagar.com

সাল থেকে ১৯৫৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭৩ সালে আরবদের সঙ্গে ইসরেলের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধগুলোতে ইসরেল এগিয়ে যায়। আরবরা কিছুই করতে পারেনি বরং অনেক সময় নিজেদের জায়গা হারিয়েছে।

প্যালেস্টিনিয়ানদের নিজ আবাসভূমি থেকে উৎখাত করে জুইশ (Jewish) কমিউনিটি বা ইহুদি সম্প্রদায়ের নিজস্ব আবাসভূমি ইসরেল সৃষ্টি ও তাকে রক্ষা করার প্রতিটি পর্যায়ে পশ্চিমা শক্তি, বিশেষ করে আমেরিকা সব সময়ই সর্বাত্মক সমর্থন যুগিয়ে এসেছে।

মালয়শিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ যথার্থই বলেছিলেন, পরোক্ষভাবে ইহুদিরাই বিশ্বকে শাসন করছে।

একটি সম্প্রদায়ের অল্প কিছু মানুষ কিভাবে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরো বলা হয়, আমেরিকা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করে আর "আমেরিকাকে নিয়ন্ত্রণ করে জুইশ কমিউনিটি।"

বিশ্বের অস্ত্র, মিডিয়া, ব্যাংক থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই জুইশ কমিউনিটির নিয়ন্ত্রণ রয়েছে পুরোপুরি। আর এ কারণে গত ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্যালেস্টিনিয়ানদের ওপর যে নিপীড়ন তারা চালিয়েছে তাকে ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন (Clash of Civilisation)-এর মোড়কে ঢুকিয়ে বৈধ করে নিয়েছে পশ্চিমা সমাজ।

বিশ্বের নিয়ন্ত্রক আমেরিকার সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি জর্জ বুশ বরাবরই প্রকাশ্যে ইহুদিদের সমর্থন করে আসছেন। আমেরিকান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইস তার প্রথম ইসরেল সফরকে বর্ণনা করেন নিজের বাড়িতে পদার্পণ সম।

বুশ প্রশাসনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদেই বসে আছেন জুইশ কমিউনিটির সদস্যরা। এরা আছেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার, পেন্টাগনের অ্যাডভাইজার, চিফ পলিসি ডিরেক্টর, পলিটিকাল মিলিটারি অ্যাফেয়ার্স কর্মকর্তা, বাজেট ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তা, ফরেন সার্ভিস ডিরেক্টর, হোয়াইট হাউসের স্পিচ রাইটারসহ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ এবং পলিসি নির্ধারণের পদগুলোতে। শুধু ভূমিতে নয়, মহাশূন্যে কাজ করার প্রতিষ্ঠান নাসার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে ডেনিয়েল গোল্ডিন ইসরেলের স্যাটেলাইট পাঠানোতে অনেক ছাড় দিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে।

www.pathagar.com

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাকংসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংক তাদের দখলে। সম্প্রতি দি ইউনাইটেড জুইশ কমিউনিটি ঘোষণা দিয়েছে, ২০০৭ সালে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটিতে তারা ২৫ মিলিয়ন ডলারের একটি ফান্ড বরাদ্দ করেছে।

ফলে খোদ আমেরিকার কেউ চাইলেও এদের কিছু করতে পারবে না। বরং জুইশ কমিউনিটি বা ইহুদি সম্প্রদায়কে হাতে না রাখলে ক্ষমতায় টেকা যাবে না।

আমেরিকার রাজনৈতিক এবং আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করে মুত কর্পরেট হাউসগুলো। তারা প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত বানাতে পারে, সরাতে পারে। এসব কর্পরেট হাউসগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় এদের মালিক কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম্পানিগুলোর মূল দায়িত্বে থাকা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা চিফ একজিকিউটিভ অফিসার, সিইও জুইশ কমিউনিটির মানুষ। এ কথা মাইক্রোসফটের জন্য যেমন সত্য তেমনি জাপানিজ কম্পানি সনির আমেরিকান অফিসের জন্যও সত্য। প্রায় অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পদে ইহুদিরা কাজ করছেন। জুইশ কমিউনিটির ক্ষমতাধর বিলিয়নোয়ররা মিলিতভাবে যে কোন ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারেন। সেটা হতে পারে অর্থে, অস্ত্রে কিংবা মিডিয়ায়।

চ. আমেরিকান মিডিয়ার মুঠোবন্দী দুর্ভাগা পৃথিবী

বিশ্বের এবং বিশেষ করে আমেররিকার জনগণের মূল নিয়ন্ত্রক মিডিয়া। তারা টিভি দেখে,মুভি দেখে, অনলাইনে কিছু নির্দিষ্ট সাইট দেখে এবং পেপার পড়ে। মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির মূল কারণ জুইশরা। এটা সম্প্রতি একটি কার্টুনএ দেখানো হয়েছে।

আমেরিকানদের মন এবং মনন পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে মিডিয়া, বিশেষ করে টিভি চ্যানেলগুলো।

আমেরিকান অন্যতম বড় মিডিয়া গ্রুপের নাম টাইম-ওয়ার্নার। এ গ্রুপের অধীনে পত্রিকা, অনলাইন বিজনেস, মুভি প্রডাকশন হাউসে এবং টিভি চ্যানেল সবই আছে। যারা নিয়মিত মুভি দেখেন বা মুভি সম্পর্কে খোঁজ রাখেন তাদের কাছে ওয়ার্নার ব্রাদার্স নামটা খুবই পরিচিতি। প্রায় ১০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এই কম্পানির প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন ইহুদি এবং বর্তমান চিফ একজিকিউটিভ অফিসার বা সিইও জেরাল্ড লেভিনসহ এর গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব পদই ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে।

www.pathagar.com

টাইম ওয়ার্নারের আরেক প্রতিষ্ঠান আমেরিকা অনলাইন বা এওএল (AOL)। এ প্রতিষ্ঠানটি ৩৪ মিলিয়ন আমেরিকান সাবস্ক্রাইবার নিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে পরিচিত। টিনএজার, নারী ও শিশুদের টার্গেট করে নামা এওএল এখন জুইশ কমিউনিটির প্ল্যাটফরমে পরিণত হয়েছে।

নব্বইয়ের দশকে ইরাক ওয়ার কভার করে আমেরিকায় ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠে সিএনএন টিভি চ্যানেলটি। এর মালিক টেড টার্নার বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পেলেও এক পর্যায়ে চ্যানেলটি চালাতে ব্যর্থ হযে আত্মসমপর্ণ করেন টাইম-ওয়ার্নার গ্রুপের কাছে। তিনি নামে থাকলেও মূল ক্ষমতা নিয়ে নিয়েছে টাইম ওয়ার্নার। ৭০ মিলিয়ন দর্শকের চ্যানেলে সিএনএন কিভাবে খবর বিকৃত করে তার একটি ছোট্ট উদহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে নাইন ইলেভেনে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পরবর্তী ঘটনাবলী। এ সময় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দৃশ্য দেখানো হচ্ছিল এর প্রতিক্রিয়া। হঠাৎ দেখা গেল প্যালেস্টাইনিরা আকাশে গুলি ছুড়ে আনন্দ প্রকাশ করছে। অর্থাৎ তারা টুইন টাওয়ার ধ্বংসে খুশি। কিছুদিন পর সিএনএন খুবই গুরুত্বহীনভাবে টেলপে জানায়, প্যালেস্টিনিয়ান ফুটেজটি ছিল পুরনো। তা ভুল করে সেদিন দেখানো হয়।

আমেরিকার সবচেয়ে বড় পে-টিভি চ্যানেলের নাম এইচবিও (HBO)। যা বাংলাদেশেও খুবই জনপ্রিয়। আমেরিকায় এর দর্শক ২৬ মিলিয়ন। এইচবিও চ্যানেলটি টাইম-ওয়ার্নার অর্থাৎ পুরোপুরি ইহুদি নিয়ন্ত্রিত এবং এর কথিত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরিচিত নিনেমেক্স আরেকটি টাইম-ওয়ার্নারের অঙ্গ সংগঠন। আমেরিকার সবচেয়ে বড় মিউজিক রেকর্ড কম্পানি পরিগ্রাম মিউজিকও তাদের দখলে।

বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ম্যাগাজিনের নাম এলে প্রথমেই উচ্চারিত হয় যে নামটি তা হল টাইম। এই পত্রিকাসহ টাইম ওয়ার্নার গ্রুপে আছে **লাইফ**, **স্পোর্টস ইলাসট্রেটেড পিপল**-এর এর মতো বিশ্বনন্দিত পত্রিকাসমূহ। এ ম্যাগাজিনগুলোর মাথার উপরে বসে এডিটর ইন চিফ হিসেবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন নরম্যান পার্লস্টাইন। যিনি একজন ইহুদি।

বিশ্বজুড়ে শিশু-কিশোরদের মনে রঙিন স্বপ্ন তৈরি করে যে প্রতিষ্ঠানটি তার নামা ওয়াল্ট ডিজনি কম্পানি। এই কম্পানির ওয়াল্ট ডিজনি টেলিভিশন, টাচস্টোন টেলিভিশন, বুয়েনা ভিসটা (Buena Vista) টেলিভিশনের আছে

www.pathagar.com

কমপক্ষে ১০০ মিলিয়ন নিয়মিত দর্শক। সিনেমা তৈরিতে কাজ করছে ওয়াল্ট ডিজনি পিকচার্স, টাচস্টোন পিকচার্স, হলিউড পিকচার্স, ক্যারভান পিকচার্সসহ আরো অনেক কিছু। ইনডিপেনডেন্ট মুভি তৈরিতে মিরাম্যাক্স অত্যন্ত জনপ্রিয়। ওয়াল্ট ডিজনী কম্পানির বর্তমান সিইও একজন ইহুদী। তার নাম মাইকেল আইসনার।

আমেরিকার আরেকটি প্রভাবশালী মিডিয়া গ্রুপের নাম ভিয়াকম (Viacom). এর প্রধান সুমনার রেডস্টোনসহ এর বড় বড় অধিকাংশ পদেই আছেন ইহুদিরা। জনপ্রিয় সিবিএস টেলিভিশন নেটওয়ার্কসহ ৩৯টি টেলিভিশন স্টেশন, ২০০টি সহযোগী স্টেশন, ১৮৫টি রেডিও স্টেশন, সিনেমা তৈরির বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান প্যারামাউন্ট পিকচার্স তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। ভিয়াকমের আরেক ইহুদি কো-প্রেসিডেন্ট টম ফ্রেসটন-এর নিয়ন্ত্রণে আছে মিউজিক চ্যানেল এমটিভি।

মুভি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সাল মিলে গিয়েছে এনবিসি গ্রুপের সঙ্গে। এনবিসি খুবই প্রভাবশালী টিভি চ্যানেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এদের মূল সংগঠন সিফ্রাম (Seafram) সহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন ইহুদি মিডিয়া মুঘল এডগার ব্রনফম্যান জুনিয়র। তার বাবা এডগার ব্রনফম্যান সিনিয়র হল ওয়ার্ল্ড জুইশ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট।

ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার আগ্রাসনকে আমেরিকানদের কাছে বৈধ হিসেবে চিত্রায়িত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ফক্স নিউজ। বিশ্ববিখ্যাত মিডিয়া মুঘল রুপার্ট মারডেকের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই জুইশদের সমর্থন দিয়ে এসেছে। কথিত আছে মারডকের মা ইহুদি ছিলেন। মূলত ফক্সনিউজ যিনি পরিচালনা করেন তার নাম পিটা শেরনিন। অবধারিতভাবে তিনিও ইহুদী। রুপার্ট মারডকের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সারা বিশ্বের অসংখ্য পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল। বাংলাদেশে জনপ্রিয় স্টার প্লাসসহ বিভিন্ন দেশে নানান ধরনের এমনকি বিপরীতধর্মী চ্যানেলও তিনি পরিচালনা করেন।

টিভি চ্যানেলগুলোর মধ্যে এবিসি, স্পোর্টস চ্যানেল, ইএসপি এন, ইতিহাস বিষয়ক হিস্ট্রি চ্যানেলসহ আমেরিকার প্রভাবশালী অধিকাংশ টিভিই ইহুদিরা নিয়ন্ত্রণ করছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে।

আমেরিকায় দৈনিক পত্রিকা বিক্রি হয় প্রতিদিন কমপক্ষে ৫৮ মিলিয়ন কপি। জাতীয় ও স্থানীয় মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার পত্রিকা সেখানে প্রকাশিত

www.pathagar.com

হয়। এ সব পত্রিকাসহ বিশ্বের অধিকাংশ পত্রিকা যে নিউজ সার্ভিসের সাহায্য নেয় তার নাম দি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস বা এপি। এই প্রতিষ্ঠানটি এখন নিয়ন্ত্রণ করছেন এর ইহুদী ম্যানেজিং এডিটর ও ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইকেল সিলভারম্যান। তিনি প্রতিদিনের খবর কি যাবে না যাবে তা ঠিক করেন।

আমেরিকার পত্রিকাগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী তিনটি পত্রিকা হল নিউ ইয়র্ক টাইমাস, ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল এবং ওয়াশিংটন পোষ্ট। তিনটি পত্রিকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ইহুদিদের হাতে।

ওয়াটারগেট কেলেংকারির জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল ওয়াশিংটন পোস্ট। এর বর্তমান সিইও ডোনাল্ড গ্রেহাম ইহুদি মালিকানার তৃতীয় প্রজন্ম হিসেবে কাজ করেছেন। উগ্রবাদী ইহুদি হিসেবে তিনি পরিচিতি। ওয়াশিংটন পোস্ট কম্পানি আরো অনেক পত্রিকা প্রকাশ করে। এর মধ্যে আর্মিদের জন্যই১১টি পত্রিকা। এই গ্রুপের আরেকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পৃথিবী জুড়ে বিখ্যাত। পত্রিকাটির ইন্টারন্যাশনাল এডিশনের সম্পাদক মুসলমান, নাম ফরিদ জাকারিয়া। যা দেখে বা কিছু ক্ষেত্রে এর উদারতার জন্য অনেকেই একে লিবারাল পত্রিকা বা ডেমক্রেট সমর্থক হিসেবে মনে করেন। টাইম-এর পরই বিশ্বের দ্বিতীয় প্রভাবশালী এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির নাম নিউজউইক।

আমেরিকার রাজনৈতিক জগতে প্রভাবশালী নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর প্রকাশক প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ইহুদিরা হয়ে আসছেন। বর্তমানে প্রকাশক ও চেয়ারম্যান আর্থার গুলজবার্জার, প্রেসিডেন্ট ও সিইও রাসেল টি লুইস এবং ভাইস চেয়ারম্যান মাইকেল গোলডেন। এরা সবাই ইহুদি।

বিশ্বের অর্থনীতি যারা নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের নিয়ন্ত্রণ করে ওয়াল্ড স্টুট জার্নাল। আঠারো লাখেরও বেশি কপি চলা এই পত্রিকার ইহুদি প্রকাশক ও চেয়ারম্যান পিটার আর কান। তেত্রিশটিরও বেশি পত্রিকা ও প্রকাশনা সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি।

আমেরিকান মুভি ইনডাস্ট্রী-র শুধু নির্মাতা প্রতিষ্ঠানই নয়, এর মুভি নির্মাতা, পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে রয়েছে ইহুদিদের প্রাধান্য। বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা মার্লোন ব্রান্ডো কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, হলিউড চালায় ইহুদিরা। এর মালিকও ইহুদিরা।

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ট্যালেনটেড পরিচালক হিসেবে পরিচিত স্টিভেন স্পিলবার্গ আরো দুই ইহুদি ব্যবসায়ী ডেভিড গেফিন ও জেফারী ক্যাজেনবার্গ-কে নিয়ে গড়ে তুলেছেন তার কম্পানি ড্রিমওয়ার্কস এসকেজি।

হলিউডে এমন অসংখ্য ব্যক্তিত্ত আছেন যারা জুইশ কমিউনিট থেকে এসেছেন। পরিচালক বিলি ওয়াইল্ডার, স্ট্যানলি কুররি, রোমান পোলানস্কি, উডি অ্যালেন যেমন আছেন এই তালিকায়; তেমনি আছেন কার্ক ডগলাস, মাইকেল ডগলাস পিটার সেলার্স, জেসিকা ট্যানডি, এলিজাবেথ টেইলর, পল নিউম্যান, বিলি কুস্টাল, ডাস্টিন হফম্যান, জেরি লুইস, রবিন উইলিয়ামস। মায়ের দিক থেকে জুইশ কমিউনিটিতে এসেছেন রবার্ট ডি নিরো, হ্যারিসন ফোর্ড, ড্যানিয়েল ডে লুইসের মতো সুপারস্টাররা। এই তালিকা অনেক লম্বা সহজে শেষ হবে না।

এসব স্টারের অংশগ্রহণই শুধু নয়, জুইশদের পক্ষে জনমত গঠনে হলিউড বা অন্যান্য অঞ্চলের মুভিগুলো ব্যপক প্রভাব ফেলছে। এসব মুভির নির্মাণ কৌশল, গুণগত মান, বুদ্ধির প্রয়োগ ও বক্তব্য সবই উঁচু মাপের। **ইহুদিদের নিয়ে যে বিষয়টি মুভিতে বেশি জায়গা করে নিয়েছে তা হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদি নির্যাতন বা হলকস্ট** (Holocaust)। বলা হয়, এ সময় প্রায় ৬০ লাখ ইহুদিকে হত্যা ও অসংখ্য ইহুদি নর-নারী ও শিশুকে নির্যাতন করে হিটলার-মুসোলিনির অক্ষশক্তি। যুদ্ধ চলার সময়ই বিশ্বখ্যাত মুভি নির্মাতা চার্লি চ্যাপলিন দি গ্রেট ডিক্টেটর নির্মাণ করে দুনিয়া কাঁপিয়ে দেন। হিটলার এবং গরিব ইহুদি নাপিত এই দুই চরিত্রে তিনি অভিনয় করেন। **জুইশদের প্রতি তিনি অনুরক্ত কি না এই ধরনের প্রশ্ন করা হলে চ্যাপলিন উত্তর দিয়েছিলেন, হিটলারের বিরোধিতার জন্য ইহুদি হওয়ার প্রয়োজন নেই।**

যুদ্ধের ষাট বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো হলকস্ট নিয়ে অসংখ্য মুভি তৈরি হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ ধরনের একাধিক মুভি অস্কার পুরস্কার পেয়েছে। রোমান পোলানস্কি-র দি পিয়ান্টি, ইটালিয়ান মুভি ডিরেক্টর রাবার্টে বেনিনির আধুনিক ক্লাসিক মুভি হিসেবে বিবেচিত লাইফ ইজ বিউটি ফুল, অন্যতম। স্পিলবার্গ সম্প্রতি তৈরি করেছেন মিউনিখ নামের বানোয়াট ও কষ্ট-কল্প একটি মুভি যেখানে প্যালেস্টিনিয়ান গেরিলাদের হামলায় ইসরেলি অ্যাথলিটদের হত্যা করার বিষয়টি এসেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে টেন কমান্ডমেনটস, ফিডলার অন দি রুফ, ফেটলেস, ডাউনফল-এর মতো মুভিগুলোতে ইহুদিদের দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে।

www.pathagar.com

এসব মুভির ক্ষমতা এতো বেশি যে, তা যে কোন দর্শকের হৃদয় ছুয়ে যেতে পারে। তারা যেভাবে চিন্তা করতে বলবে, সবাইকে সেভাবেই চিন্তা করতে হচ্ছে। এভাবে সম্প্রতি শক্তি, বুদ্ধি এবং আবেগ সবকিছুই জুইশ কমিউনিটি মুঠোবন্দী করে রেখেছে। এবং সম্ভবত একারণেই বলা হয় Modern World is the World of 3-Ps. Press, Platform and Propaganda; ইহুদীয়া এর নিয়ন্ত্রণে আছে বলে বর্তমান বিশ্ব এদের মুষ্টিতে আটক রয়েছে।

ছ. জনৈক শিল্পীর চোখে জুইশ কমিউনিটি অত্যাচারিত থেকে অত্যাচারী হওয়ার সত্য চিত্র :

জুইশ কমিউনিটি বা ইহুদী সম্প্রদায়ের ইতিহাস প্রায় তিন হাজার বছরের পুরনো। পৃথিবীর ইতিহাস টেনে আনলে দেখা যায়, ইহুদিরা হল সবচেয়ে অত্যাচারিত সম্প্দ্রায় যাদের ওপর বছরের পর বছর শুধু নয়, শত শত বছর ধরেই অত্যাচার করা হয়েছে। একটি নির্যাতিত ও অত্যাচারিত সম্প্রদায় কিভাবে নিজেরাই অত্যাচারী হয়ে উঠলো সে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তিন হাজার বছর মধ্যপ্রাচ্যে ইসরেলিদের আদিবাস ছিল। তবে তারা এখন যে জায়গা চিহ্নিত করছে তা নিয়ে বিতর্ক আছে। মুসা নবী বা মোজেস (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই সম্প্রদায়ের সবচেয়ে সুন্দর সময় গিয়েছে খৃস্টপূর্ব এক হাজার বছর আগে সম্রাট দাউদ (আ.) বা ডেভিডের সময়। দাবি করা হয় বর্তমান সময়ের লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান ও ইজিপ্টের বড় অংশই ছিল তখনকার কিংডম অফ ইসরেলের অংশ। ডেভিডের ছেলে সলোমন বা সোলয়ামানের (আ.) সময়ও অবস্থা ভালো ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর জাতি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এ সময় অ্যাসিরিয়ানরা ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ে ও দখল করে নেয় তাদের অঞ্চল। এরপর বিভিন্ন সময় ব্যবিলনিয়ান, পার্সিয়ান, হেলেনেস্টিক, রোমান, বাইজেনটাইন, অটোম্যান, বৃটিশ শাসনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের শাসন চলে এই অঞ্চলে। আর এর প্রায় অনেকটা সময় জুড়েই ইহুদিদের তাড়া খেতে হয়।

ইজিপশিয়ান ফারাওদের সময় থেকে শুরু করে জার্মানির হিটলারের সময় পর্যন্ত তাদের বিতাড়িত হতে হয়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে। তবে এখন যেমন ইহুদিদের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘাত চলছে এক সময় তা ছিল কৃশ্চিয়ান সাম্প্রদায়ের সাথে সংঘাত। উল্লেখ্য, স্পেনে মুসলমানদের রাজত্বে ইহুদিরা খুবই ভালো ছিল। তারা এ সময় তাদের বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করার ব্যাপক সুযোগ পায়।

মুসলমানদের এই উদারতার কথা ফুটে উঠেছে ইহুদিদেরই লেখা ইতিহাসে বইয়ের পাতায়।

শুরু থেকেই বিভিন্ন সমাজে সুদ প্রথায় ব্যবসা ও চাণক্য-ষড়যন্ত্রের জন্য ইহুদিদেরকে ঘৃণিত, অবহেলিত ও খারাপভাবে দেখা হতো। প্রায় প্রতিটি জায়গায় তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকতো। উগ্র কৃশ্চিয়ানরা তাদের কখনোই সহ্য করতে পারেননি। ইহুদিদের অনেককেই যিশুর হত্যাকারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন তারা। তাই অনেকেই তাদের অভিশপ্ত জাতি মনে করেন।

ইহুদিরা যেহেতু তাড়া খেতো বেশী সেহেতু তারা যাযাবর জীবনে স্থায়ী কাজের চেয়ে বুদ্ধিনির্ভর ও কম শারীরিক পরিশ্রমের কাজ বেছে নেয়। ব্যবসার প্রতি কৃশ্চিয়ানদের অনীহা তাদের সামনে বড় সুযোগ এনে দেয়। তাদের বসবাসের পরিবেশ ছিল খুব খারাপ। ভালো খাবার-দাবারও ছিল না। ফলে তারা এমন সব কাজে আত্মনিয়োগ করে যেখানে বুদ্ধির চর্চা বেশি। ব্যবসা, টাকা-পয়সা লেনদেন, দালালি এসব কাজে তারা এগিয়ে যায় বেঁচে থাকার সহজাত প্রবৃত্তির জন্য।

জুইশ কমিউনিটিকে ইওরোপে কিভাবে দেখা হতো তার বড় উদাহরণ হতে পারে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের মার্চেন্ট অফ ভেনিস নাটকের শাইলক চরিত্রটি। যে শরীরের মাংস কেটে তার পাওনা আদায়ের দাবি জানায়। সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজের প্রেক্ষাপট নিয়ে লেখা রাশিয়ান লেখক নিকোলাই গোগল তার তারাস বুরবা উপন্যাসে আরেক ইহুদি সুযোগ সন্ধানী চরিত্র ইয়ানকেল-কে সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন। তাদের সম্পর্কে তখনকার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের মনোভাব ছিল এমনটি।

যাহোক ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়মিত তাড়া খেয়ে তারা মিডল ইস্টে ঢুকতে থাকে। এর মধ্যে ইউরোপিয়ান একটি চালও ছিল। কৃশ্চিয়ানরা যেহেতু ইহুদিদের পছন্দ করতো না তাই তারাও চাচ্ছিল মুসলমানদের এলাকায় ইহুদিদের ঢুকিয়ে দিতে। প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে যাযাবর জীবনের অবসানও চাচ্ছিল ইহুদিরা।

এতোগুলো বছর ব্যাপী ইহুদীদের ঐক্য ধরে রাখার বড় শক্তি ছিল ধর্ম। বিশ্বের বহু দেশে ছড়িয়ে পড়লেও জুইশ কমিউনিটির মধ্যে সব বময় স্বপ্ন ছিল তারা তাদের নিজ দেশ ইসরেলে ফিরে যাবে যদিও তখনো এর কোন ভৌগোলিক অস্তিত্ব ছিল না। ইসরেল তাদের মাতৃভূমি ও ধর্মভূমিই শুধু নয়, তাদের স্বপ্নভূমিও বটে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ওরা স্বপ্ন দেখেছে ইসরেল নামের

www.pathagar.com

দেশের (নেক্সট ইয়ার ইন জেরুজালেম) এই স্লোগানকে মাথায় রেখে বহু ইহুদি মারা গিয়েছে। ইসরেলের জন্য তারা সাধ্য মতো দান করেছে, ধর্ম ও বিশ্বাস দিয়ে নিজেদের এক করে রেখেছে। সংখ্যায় অত্যন্ত কম হওয়ার পরও ক্ষুরধার বুদ্ধি, অপকৌশল ও মেধার বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে নিজেদের বসিয়েছে।

কোন মেধাবী ইহুদী ছাত্র বা ছাত্রীর পড়াশুনার জন্য চিন্তা করতে হয় না। এখনো বহু ওয়েব সাইটে এদের জন্য দান গ্রহণ করা হয়। তারা প্রধানত মাতৃতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখে। কমিউনিটির কেউ বিপদে পড়লে তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এমন অনেক ওয়েব সাইট আছে যেখানে ইহুদি পরিবারগুলোর বংশলতিকা বা ফ্যামিলি ট্রি তৈরী করতেও সাহায্য করে।

বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ধাওয়া খেয়ে বহু দেশে ছড়িয়ে পড়লেও ইহুদিরা তাদের স্বপ্নভূমির কথা কখনো ভোলেনি। এক্ষেত্রে তারা কট্টর ও চরমপন্থী। কারণ মিডল ইস্টের কোন এক জায়গায় তাদের জন্মভূমি ছিল তিন হাজার বছর আগে সেই যুক্তিতে একটি জায়গার দখল নেয়া একটি অবাস্তব বিষয়। কেননা এর কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কিন্তু জুইশরা তা তৈরী করে নিয়েছে। তারা বিশ্ব শক্তিকে তাদের পক্ষে কাজে লাগিয়েছে।

ইরাক যখন কুয়েত দখল করে নেয় তখন সাদ্দাম হোসেন বলেছিলেন, কুয়েত ঐতিহাসিকভাবে ইরাকের অংশ। কিন্তু সেযুক্তি বাতিল হলেও জুইশদের যুক্তি বাতিল হয়নি। ইসরেল রাষ্ট্রটির যখন জন্ম হল ১৯৪৮ সালে তখন এক জোট হয়ে আরব দেশগুলো আক্রমণ চালিয়েও চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

বর্তমান বিশ্বে জুইশ কমিউনিটিতে লোকসংখ্যা ১২ থেকে ১৪ মিলিয়ন। অর্থাৎ সর্বোচ্চ প্রায় দেড় কোটি। তাও তারা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন দেশে। যেমন আমেরিকায় আছে ৬০ লাখ, ইসরেলে প্রায় ৫০ লাখ, পোল্যান্ড, রাশিয়া, সাউথ আফ্রিকা, ওয়েস্টোর্ন ইওরোপ, ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশে বাকীসব।

জনসংখ্যার দিক দিয়ে ঢাকা শহরের কাছাকাছি হলেও জুইশ কমিউনিটি থেকে যুগে যুগে বেরিয়ে এসেছেন অসংখ্য প্রতিভাবান ব্যক্তি। প্রধান ধর্মগুলোর পর পৃথিবীতে যে মতবাদটি সবচেয়ে প্রভাব ফেলেছে সেই কমিউনিজমের স্বপ্নদ্রষ্টা কার্ল মার্কস জুইশ কমিউনিটি থেকে এসেছেন। বিশ্বের মানুষকে মুগ্ধ করে রাখা জাদুশিল্পী হুডিনি এবং বর্তমানে ডেভিড কপারফিল্ড এসেছে একই কমিউনিটি থেকে। লেখকদের মধ্যে আর্থার মিলার ফ্রানজ কাফকা, জন

www.pathagar.com

স্টাইনব্যাক যেমন এসেছেন তেমনি এসেছেন সায়েন্স ফিকশন জগতে সবচেয়ে আলোচিত লেখক আইজাক আসিমভ। মিউজিকে ইহুদী মেনুহিনের অসাধারণ ভায়োলিনের পাশাপাশি রিঙ্গো স্টার, মার্ক নাফলারের মতো বাদক যেমন এসেছেন তেমনি এসেছেন বব ডিলান, বব মার্লির মতো গায়কও ।

মাত্র কয়েকজনের নাম দেয়া হল। এ ধরনের নাম অসংখ্য আছে।

জুইশ কমিউনিটির সদস্যদের হাতে মেডিসিন, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ইকনমিক্স, ইত্যাদিতে ১৭৫টি ও বেশি নোবেল পুরস্কার এসেছে। এ থেকে তাদের মেধার বিস্তার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া সম্ভব।

ইসরেলের প্রয়োজনে এসব বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, মিডিয়া মুঘল, রাজনীতিবিদ সবাই মিলিতভাবে তাদের স্বপ্নভূমিকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন। তারা যে মতেরই হোন না কেন, এ বিষয়ে তাদের কোন মতভেদ থাকে না। ফলে হাজার অপরাধ করার পরও ইসরেলকে স্পর্শ করা যায় না। শুধু আবেগ বা অভিশাপ দিয়ে ইসরেলকে দমন করা সম্ভব নয়। কেননা এর ভূমিটুকু আছে মিডল ইস্টে কিন্তু এর নিয়ন্ত্রকরা আছেন বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ জুড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে ব্যাপকভাবে ইহুদি নিধন শুরু হয়। এ সময় অসংখ্য ইহুদী জার্মানি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এদের মধ্যে আছেন গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন। বিশ্ব জুড়ে ইহুদিদের ওপর হামলার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছিলেন,

There are no German Jews, there are no Russian Jews. there are in fact only Jews.

অর্থাৎ জার্মান ইহুদি বলে কিছু নেই, রাশিয়ান বা আমেরিকান ইহুদি বলেও নয় ... আসলে ইহুদিরা সবাই এক।

মাত্র পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এসেই কথার মানেটা অনেকটাই বদলে গিয়েছে। আসলেই জুইশরা সব এক। তবে তারা এখন নির্যাতিত হচ্ছে না। আর নিয়তির পরিহাস এই যে এখন তারা নির্যাতন করছে এবং বিশ্বকে করছে নিয়ন্ত্রণ।

[সৌজন্য : মোহাম্মদ মাহমুদুজ্জামান : Mahmud jaijaidin com, 15 July 2006]
জনাব মোহাম্মদ মাহমুদুজ্জামেরনের এই প্রতিবেদনটিতে এটা দিবালোকের ন্যায় পরিস্ফুট যে, The Jeus are the scourge of God upon the universe, and one Jew is equivalent to one 'Bosola', the tombmaker of humainty.

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

1. Arnold Toyanbee, War and Civilazation, Oxf.
2. Ibne Khaldun, Mukaddama.
3. Ismail Al-Faruqi, Islam and the Problem of Israel, London, 1980.
4. Dr. Hans Kurse, The Foundation of Islamic International Jurisprudence, Pakistan History Society, Karachi.
5. M. Khaduri, War and Peace in the Law of Islam, Baltimore, 1955
6. Dr. F. R. Ansar, The Quranic Foundations and Structure of Muslim Society, Karachi. Vol.I
7. এস. কে. আহমত, হযরত মোহাম্মদ (সা.) জয়বুকস, ইন্টারন্যাশনাল, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯।
8. মুস্তাফিজুর রহমান, গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁর সহজ অনুবাদ, মীনাবুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
9. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৮২।
10. সুফীনজর, মুহাম্মদ, অনুবাদ : মুহাম্মদ রফিকুল্লাহ নেছারাবাদী, ই. ফা. বা. (১৯৮৬)
11. মুসলিম ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদের অধিকার দৈ ইত্তেফাক, ফেব্রু ২৯, ২০০৩।
12. তাফসীর মা' আরেফুল কোরআন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংগ্রামের বিভিন্ন নিউজ ও আর্টিকেল (১৯৯৬-২০০৫ অবধি,)

www.pathagar.com

ইসলামে যুদ্ধ কঠিন এবাদত। এ জন্য ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞের প্রতিষেধক। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও কাল নির্বিশেষে মানবিক অধিকার সংরক্ষণ ও পরিপোষণের ঐশ্বরিক বিধানই হচ্ছে ইসলামে যুদ্ধ।

ISBN 984-642-181-8
9 789846 421811